International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-VI, May 2016, Page No. 33-51
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বাংলার ষষ্ঠীব্রত: শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নিরিখে একটি পর্যবেক্ষণ

সুবর্ণা সরকার
জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, আর.জি.এন.এফ (ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Custom is an immense important aspect of folklore. Among the varities of customs, Brata (Vow) is especially mentionable. Sashti Brata is one such brata which is thoroughly popular all over Bengal. On the other hand, Sashti Brata is inextricably related with an important genre of folklore that is Children's Folklore. The goddess is considered as the child granter and the savior of them. Mythologies advocated that the goddess Sashti is the spiritual dauther of Lord Bramha and also the wife, or mother (which is debatable) of Kartick, the army general of gods. But by the common people she has always been treated as folk goddess. The worshipping of this goddess is mandatory on the 6th and 21st day after birth of the baby. Again on all the Sukla Sashti throughout the year Devi Sashti is worshipped by the women in different manifestations keeping various causes in mind. The impact of this goddess is compact with the culture of Bengal. As a result, the name or context of her comes up in case of belief and culture, literature, naming ceremony and also in case of toponymy. The relation of Sashti Devi with tree worshipping, forest and associated things are integral.The naming of the goddess, her identity in folk society and black cat as her cult-animal demand anthropological and scientific explanation apart from her worshipping. But in brief we can say that child granting goddess and protector of children is her prime identity. And for this reason, even barren women or the women who cannot become pregnant but once, worship the goddess.

In this paper, we have highlighted the identity of Sashti Brata in folklore, its versatility, and related rituals-customs, social and cultural significance from the viewpoint of children's folklore.

Key Words: Children's Folklore, Custom, Ritual, Vow, Worship.

ভূমিকা: আদিম মানুষের জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা থেকে জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন দেবদেবী। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চয়তা বা পরবর্তীকালের উত্তম ফসল উৎপাদনের নিশ্চয়তার সন্ধান, বিভিন্ন রোগব্যাধির কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থতা প্রভৃতির কারণে মানুষের মনে জন্ম নিল ভয় এবং এই ভয় নিবারণের উৎস থেকেই জন্ম নিল বিভিন্ন দেবদেবী; শুরু হল তাদের অর্চনার রকমারি নিয়ম-বিধি। পরবর্তীকালে এই দেবদেবীগণ দুটি প্রাথমিক পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে গেলেন: ১) পৌরাণিক দেবদেবী এবং ২) লৌকিক দেবদেবী। এঁদের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীগণ সম্পূর্ণরূপে লোকসমাজের জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ যাতে বাধাহীন হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। যেমন পারিবারিক শান্তিরক্ষা, গ্রাম-সমাজের শান্তিরক্ষা, সন্তানের মঙ্গলকামনা বা পরিবারবর্গের হিতসাধনা, নিশ্চিন্ত জীবন বা জীবিকা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চিন্তামুক্তি, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের জন্যেই লোকসমাজ নিজেদের মানসলোক থেকে বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছে। এঁদের কেউ

সাকার, কেউবা নিরাকার প্রস্তরখন্ড মাত্র। এই রকমই এক লৌকিক দেবী হলেন মা ষষ্ঠী। তিনি শিশু রক্ষয়িত্রী এবং সন্তানদায়িনী বলেই সমাজে খ্যাত। বাংলার সর্বত্র মা ষষ্ঠীর প্রাধান্য সমানভাবে স্বীকৃত। এই মা ষষ্ঠীর পূজার্চনা বিধিই ষষ্ঠীব্রত নামে পরিচিত।

প্রসঙ্গ শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হল লোকসংস্কৃতির এমন একটি ধারা যেখানে সমগ্র শিশুর জগৎটিই মুখ্য। অর্থাৎ শিশুদের নিয়েই এই ক্ষেত্র আবর্তিত হতে থাকে। শিশুদের যে একটি নিজস্ব লোকসংস্কৃতির বলয় আছে, যা তাদের জন্য এবং তাদেরকে নিয়েই গড়ে উঠেছে সেই বিষয়টিই শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির (Childen's Folklore) মূল উপজীব্য। এই কথা প্রসঙ্গে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি তাঁর 'শিশু-চারণা' নামক গ্রন্থে এর এক চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে: "'Folk lore'-এর 'লোক' [Folk] বলতে বুঝি পূর্ণবয়স্ক মানুষ। কিন্তু শিশুর বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের Lore যা আছে তা একটি পৃথক জগৎ, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব। সেই কথা মনে রেখেই, প্রবন্ধের এই বিষয় স্থির করেছি - Childlore বা 'শিশুচারণা'। আমার মতে, 'লোকচারণা'র মতো 'শিশুচারণা'ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হতে পারে।"[১]

লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি বজায় রাখার জন্য শিশুদের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এবং এর পাশাপাশি গুরুত্ব রয়েছে শিশুদের কেন্দ্র করে সংঘটিত সামাজিক সমস্ত কৃত্যাদির। এই প্রসঙ্গেই লোকসমাজের বহুল পরিচিত 'ষষ্ঠীব্রত' নামক লৌকিক কৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত যেসব শিশুকেন্দ্রিক লোকাচার আছে তার মধ্যে ষষ্ঠীব্রত অন্যতম।

ষষ্ঠীদেবীর পরিচয়: বিভিন্ন পুরাণে মা ষষ্ঠীর উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি বৈদিক দেবী নন। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রতীতি হয় যে, তিনি আর্যেতর দেবী। আদিম মাতৃকাপূজার একটি অংশ হল ষষ্ঠীপূজা। পুরাণ বা অভিধান থেকে মা ষষ্ঠীর যে পরিচয় আমরা পাই সেগুলি নিম্নরূপ: স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী দেবী ষষ্ঠী হলেন কার্তিকের স্ত্রী। তিনি ব্রহ্মার মানসকন্যা, নাম দেবসেনা এবং মাতৃকার মধ্যে প্রধানা। তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ রূপা। আবার মতান্তরে কোথাও বলা হচ্ছে ষষ্ঠী হলেন দুর্গার একটি অভিধা। অর্থাৎ কার্তিকের জননী বা কাত্যায়নী। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রীর গর্ভে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয়জন জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা হলেন সপ্তর্ষিরর মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী ভিন্ন অবশিষ্ট ছয়জন ঋষির স্ত্রী। তাদের মিলিত তেজঃপুঞ্জ থেকে কার্তিকের জন্ম এবং এই ছয় মাতৃকার স্তন্যপানে তিনি পালিত হয়েছিলেন। কৃত্তিকাদি যে ছয়মাতৃকা তাদের সমবেত মূর্তিই ষষ্ঠী নামে পরিচিত। এছাড়া মহাভারতে মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধের বিবরণে জানা যায়- জরা রাক্ষসীর নামান্তর। ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। ইনি গৃহস্থের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতেন বলে ব্রহ্মা এঁর নাম রাখেন "গৃহদেবী"। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্না সপুত্রা এঁর মূর্তি গৃহে রাখে, তার গৃহ সর্বদা ধনধান্য, পুত্রকন্যাদিতে পূর্ণ থাকে। এর নাম ষষ্ঠীদেবী।[২]

এইদিক থেকে বিচার করলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতীর সাথে ষষ্ঠীদেবীর অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দেবী হারিতী হলেন বজ্রযান সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী। পুরাণ মতে হারিতীও ছিলেন একজন যক্ষিনী বা রাক্ষসী, যিনি রাজগৃহে থাকতেন যখন গৌতম বুদ্ধ সেখানে বাস করতেন। প্রথমে তিনি ছিলেন শিশুদের অনিষ্টকারী কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের বোধিজ্ঞান লাভ করার ফলে তিনি শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবীতে রূপান্তরিত হন। বিবর্তনের আদিযুগে হারিতীর শিশু অনিষ্টকারী গুণটি ষষ্ঠীতে আরোপিত হয়।

ষষ্ঠীদেবীর স্বরূপ: দেবী ষষ্ঠী সর্বত্র লৌকিক দেবী হিসাবে পূজা পান। বিভিন্ন পুরাণে তাঁর উল্লেখ থাকলেও তিনি বৈদিক দেবী নন। আদিম মাতৃপূজার একটি অংশ হিসাবে ষষ্ঠীপূজা ধরা যায়। এই দেবী প্রজনন-শক্তির দেবী। বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রানুসন্ধান করে বা বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে আমরা দেবীর বর্ণনা পাই যা থেকে দেবীর রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মায়। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', মুকুন্দরাম দাসের 'কবিকঙ্কণ চন্ডী' ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবী ষষ্ঠীর বর্ণনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন ভাস্কর্যে ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজশাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে একটি চতুর্ভুজা ষষ্ঠীমূর্তি ও তাঁর ক্রোড়ে শিশুসন্তান এবং দেবীর দক্ষিণপদ ঊর্ধ্বমুখী একটি বিড়ালের উপর স্থাপিত আছে। এই মূর্তির দক্ষিণ হস্তে আছে সপত্র বৃক্ষশাখা। আবার বগুড়া জেলায় অনুরূপ একটি ষষ্ঠীমূর্তির দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে বলে জানা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে, বালাসোর জেলার টুগুরা গ্রামে এবং শশখন্ড গ্রামে দৃষ্ট যে স্কন্দষষ্ঠীর মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন তার সাথে মনসার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত স্কন্দষষ্ঠীর মূর্তি দ্বিভুজা, পদ্মাসীনা, নানা অলঙ্কারভূষিতা, মস্তকে সাতটি সাপ ফণা বিস্তার করে

আছে, বাম উরুর উপর উপবিষ্ট একটি শিশুকে বাম হাত দিয়ে ধরে আছেন। মূর্তির ডান হাতে একটি সাপ রয়েছে।[৩] তবে পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্রমাসে যে স্কন্দষষ্ঠী পূজার মন্ত্র পাওয়া যায় তাতে দেবীর সর্পের কথার কোন উল্লেখ নেই। এমনকি চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ষষ্ঠীদেবীর যে মূর্তি দেখা যায় সেখানে সর্পের কোন চিহ্ন নেই। দেবীর বাম কোলে শিশু, পায়ের নিচে বিড়াল। অথবা দেবী বিড়ালে আরূঢ়া, বিড়ালটি কোথাও কালো, কোথাও সাদা। এ-অঞ্চলে বড়ো আকৃতির ষষ্ঠী মূর্তি দেখা যায়না। অধিকাংশ মূর্তি এক ফুটের মধ্যেই। সন্তান একুশ বা তিরিশ দিন হলেই গৃহে এরূপ ষষ্ঠী মূর্তি এনে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজানুষ্ঠান করা হয়। দেবিকে রক্তবস্ত্র পরিয়ে (জড়িয়ে) পূজা করা হয়। মূর্তিটি সুন্দর ও সুশ্রী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তির মতোই। তবে এক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে মনসা ও ষষ্ঠীদেবীর মধ্যে বহু স্থানেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু মূর্তিতেই নয়, চরিত্রেও। কারণ উভয় দেবীই প্রজননের দেবী রূপে স্বীকৃত এবং এর কারণ স্বরূপ এঁদের বাহনকে দায়ী করা যায়। কারণ মনসার সর্প এবং ষষ্ঠীর বিড়াল- উভয়েই বহু শাবকের জন্ম দিতে সক্ষম। তাই চেহারাগত এবং চরিত্রগত, উভয়ক্ষেত্রেই দুই দেবীর সাদৃশ্য আছে। আর তাই উত্তরবঙ্গের 'ষাইটোর ব্রত' মনসার পাশাপাশি ষষ্ঠীরও আরাধনার মাধ্যম।

তবে সর্বত্র ষষ্ঠীর মূর্তি পূজা করা হয়না। অনেক ক্ষেত্রে শিলাখন্ডকেও ষষ্ঠীরূপে পূজা করা হয়। যেমন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শিরাকোল ও আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ষষ্ঠীর ব্যাপকভাবে শিলাখন্ড পূজার প্রচলন আছে। মন্দিরে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তির সাথে ষষ্ঠীদেবীর শিলাখণ্ড ভক্তগণ তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করেন। বিষ্ণুপুর থানার দক্ষিণচন্ডী গ্রামের একটি থানে ষষ্ঠী, মহাদেব, শীতলার তিনটি মূর্তি বা শিলা আছে। এখানে এই দেবদেবীদের নিত্য পূজা হয়। একক ষষ্ঠী মন্দির চব্বিশ পরগণায় দেখা যায়না। সাধারণত গৃহস্থের ঠাকুরঘর অথবা ধানের গোলার নিচে ষষ্ঠীমূর্তি বা ষষ্ঠীনুড়ি সারাবছর স্থাপিত থাকে।

ষষ্ঠীব্রতের প্রচলনের উৎস: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদা তপস্যায় নিরত থাকতেন। একদিন ব্রহ্মা তাঁকে সন্তান লাভের জন্য বিবাহ করতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশ পালন করলেও বহুকাল তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান লাভের জন্য তিনি কশ্যপ ঋষির সাহায্যে পুত্রষ্টি যজ্ঞ করলেন। কিন্তু রাজমহিষী মৃত পুত্র প্রসব করলেন। তাকে নিয়ে রাজা শ্মশানে এলে ষষ্ঠীদেবী আবির্ভূতা হলেন এবং রাজার সব কথা শুনে নিজ পরিচয় দিলেন। এরপর তপস্যা দ্বারা মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা তখন দেবীকে স্তব করে তুষ্ট করলেন। দেবী বলেন যে রাজা স্বয়ং তাঁর পূজার অনুষ্ঠান করলে এবং সমগ্র রাজ্যে এই পূজার প্রচলন করলে এই পুত্রকে তিনি প্রত্যার্পণ করবেন। রাজা দেবীর কথায় স্বীকৃত হয়ে দেবী ষষ্ঠীর পূজা করলেন এবং সমগ্র রাজ্যে প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর পূজার আদেশ দিলেন। এছাড়া শিশু জন্মের ষষ্ঠ এবং একবিংশতম দিনেও ষষ্ঠী পূজার প্রচলন করলেন। এরপর থেকে এই বিধি অনুযায়ী জনসমাজ তথা লোকসমাজে ষষ্ঠীদেবীর পূজা এবং ব্রত পালন করা হয়ে আসছে।

ষষ্ঠীব্রতের উদ্দেশ্য: ব্রত হল নারীহৃদয়ের চিরন্তন আকুতির বহিঃপ্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন চাহিদা পূরণ যাতে নির্বিঘ্নে ও যথাযথভাবে হতে পারে সেই আশা নিয়েই বঙ্গনারীর ব্রত উদ্‌যাপন করা। ষষ্ঠীব্রতও এর ব্যতিক্রম নয়। নিজের সন্তান তথা পরিবারের সকলের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয় ষষ্ঠীব্রত। ষষ্ঠীদেবী যেহেতু শিশুরক্ষয়িত্রী এবং সন্তানদায়িনী দেবী তাই ষষ্ঠীব্রতের মূল উদ্দেশ্য হল সন্তানের সার্বিক মঙ্গলসাধন, যা বারো মাসের বিভিন্ন ষষ্ঠীব্রতের মধ্য দিয়ে নানারূপে ধরা দেয়। কখনো সন্তানকে ধুলোবালি থেকে রক্ষার জন্য, কখনো সন্তানকে অকালমৃত্যুর থেকে রক্ষার জন্য, কখনো আবার সন্তানের আয়ুবৃদ্ধি বা ধনবৃদ্ধির জন্য, আবার কখনো তার সুস্থ ও নিরোগ দেহের কামনা করে মাতৃহৃদয় ষষ্ঠীদেবীর ব্রত পালন করে থাকেন। শুধু মানব শিশুই নয়, রাখাল বালকের মায়েরা 'গোঠ ষষ্ঠী' পালন করেন মাঠে-ঘাটে-গোঠে তাদের সন্তানের পাশাপাশি গো-শাবকগুলিও যাতে নিরাপদে থাকে সেই উদ্দেশ্যে। আর কেবল সন্তানবতী মায়েরাই নন,বন্ধ্যানারীও সন্তানলাভের আশায় (মূলত পুত্র সন্তান) ষষ্ঠীব্রত নিষ্ঠাভরে পালন করে থাকেন। এই একই উদ্দেশ্যে মৃতবৎসা ও কাকবন্ধ্যা নারীরাও ষষ্ঠীদেবীর ব্রত পালন করে থাকেন।

ষষ্ঠীব্রতের সামাজিক স্বরূপ: বাংলার নারীসমাজের মধ্যে ষষ্ঠীদেবীর প্রাধান্য সর্বাধিক। পুরাণ বা অভিধান যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন, লোকসমাজে ষষ্ঠীদেবীর প্রধান পরিচিতি শিশুর রক্ষয়িত্রী ও সন্তানদায়িনী দেবী রূপে। মূলত শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে তাঁর অর্চনার বিধি আছে। ষষ্ঠদিনে যে ষষ্ঠীপূজা হয় সেটি 'সূতিকাষষ্ঠী' বা 'ঘাটষষ্ঠী' নামে পরিচিত। কোনো কোনো অঞ্চলে একেই আবার 'ষেঠেরা' বা 'ষাটষষ্ঠী' বলে। এই ষষ্ঠীপূজা হয় মূলত দুটি জায়গায়, একটি কোনো একটি জলাশয়ের ঘাটে এবং অপরটি নবজাতক শিশুর আঁতুড়ঘরে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠদিনে পুকুরঘাটে ঘাটষষ্ঠীর পূজা হয়। কাঁচা মাটির একটি গোলাকার পিন্ড এবং শিলনোড়া দেবী ষষ্ঠী এবং পুত্র কোলে মাতার প্রতীকরূপে পূজিত হন। এছাড়া আঁতুড়ঘরের

মধ্যেই সেইদিন ষষ্ঠী পূজা করা হয়ে থাকে। মূলত আঁতুড়ঘরে পূজাটি হয় বলে একে সূতিকাষষ্ঠী বলে। এই সূতিকাষষ্ঠীকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্মে কোনো গোষ্ঠী বা গোত্রের কল্পনা করা যায়না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের বাড়িতেই জন্মের ছয়দিনের দিন সূতিকাষষ্ঠী পুজো হয়। শিশুর ঘরে রাতে একটা ছোট পিঁড়ি ও একটা জলভরা ঘট পাতা হয়। সঙ্গে থাকে একটা গামছা। পাশে কলার খোলা বা পাতা কিংবা রেকাবে থাকে সোয়াসের চাল, ধান। একটা কুলোর মধ্যে পান-সুপারি, লাল সুতো, দোয়াত, কালি, কঞ্চির কলম, কিছু কদমা, বাতাসা, মিষ্টি, পুজোর সামগ্রী, তিনটি হলুদ, সোয়া হিসাবে ক্ষমতা মতো পয়সা ইত্যাদি। ষষ্ঠীর আসনে দেওয়া হয় একটি অখন্ড কলার ছড়া। কোথাও কোথাও ইঁদুরের মাটি ও সাপের খোলসও দেয়। এইদিন সারারাত ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বিশ্বাস যে এইদিন রাতে বিধাতাপুরুষ নিজে এসে জাতকের ভাগ্যলিপি লেখেন। তাঁর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় লেখনি আর তালপাতা। এই সূতিকাষষ্ঠীর পূজারী হন দাইমা নিজে। এই রাতকে অনেকে বলেন 'ছয়রাত'। এই পুজো উপলক্ষ্যে ঘরের দেওয়ালে দেওয়া হয় 'বসুধারা' সহ 'গৌরী-আলপনা' (চিত্র নং. ১)। ঘটে আঁকা হয় 'স্বস্তিকা' আর আসনে আঁকা থাকে 'হাতে পো কাঁখে পো' ষষ্ঠীর আলপনা (চিত্র নং. ২ ও ৩)। এই অনুষ্ঠানের সমগ্র দান-সামগ্রী দাইমার প্রাপ্য। এইদিনে অনেকেই 'ষষ্ঠীমঙ্গল' যাত্রা অভিনয় করেন।

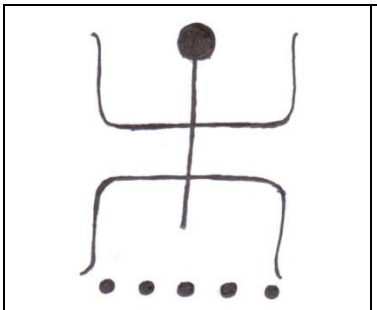

চিত্র নং. ১ বসুধারা আলপনা

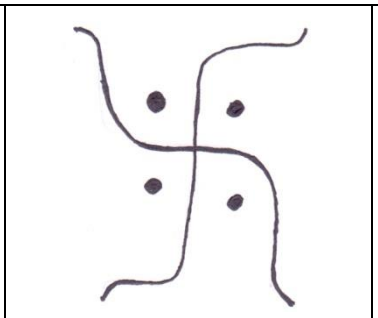

চিত্র নং. ২ স্বস্তিকা

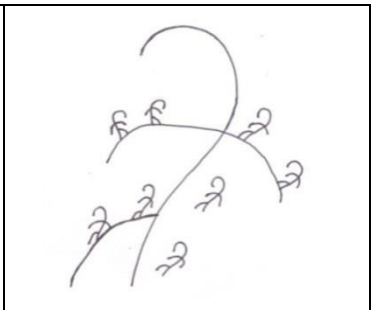

চিত্র নং. ৩ হাতে পো কাঁখে পো

ছয়দিনের পর আবার শিশুর একুশ দিন বয়সে দ্বিতীয়বার ষষ্ঠীপুজো করা হয়। একে বলে 'একুশে' বা 'একুশ্যা' কিংবা 'শুদ্ধষষ্ঠী'। শিশুর জন্মের পর সদ্যপ্রসূতি আঁতুড়ঘরেই কাটান। এই আঁতুড়ঘরে তাকে কুড়িদিন থাকতে হয়। একুশ দিনের দিন সকালে জননী ও সন্তানকে ভালোভাবে স্নান করানো হয়। তারপর পুরোহিত ডেকে ষষ্ঠীপুজো করে মা ও সন্তানের মাথায় দুধ গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যিনি সর্বদা প্রসূতির কাছাকাছি থাকতেন তার মাথায় আর গৃহের সর্বত্র এই দুধ গঙ্গাজল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই দুধ গঙ্গাজলের মিশ্রণকে বলা হয় 'শান্তিজল' এবং শান্তিজল ছিটিয়ে ঘরে তোলার এই পদ্ধতিকে বলা হয় শুদ্ধষষ্ঠী। এই শুদ্ধষষ্ঠীর পুজোটি হয় ঘরের বা উঠোনের ঈশানকোণে ঘটস্থাপন ও আসন পেতে। ঘটের পাশে থাকে শিলনোড়া, লৌহ লেখনী, তালপাতা এবং কেয়াগাছের পর্বসন্ধি। বাংলার এই ষষ্ঠীপুজোর রীতির সঙ্গে কতকগুলির কাল্টের যোগ আছে। সন্তান জন্মাবার ছয়দিন পরে যে অনুষ্ঠান হয় ঠিক এইরকম অনুষ্ঠান মহারাষ্ট্রের মহিলারাও পালন করে থাকেন। ডি. ডি. কোসাম্বীর মতে, "The sati and the Sati Asara should not be confused with each other nor with a remarkable, Primitive and dangerous mother goddess satvai or satvi or the last also a term of abuse in marathi for an unpleasant harridan. The word is derived without question from sanskrit sasthe, the sixth whatever her original name or names were. The goddess satavi is to be propitiated or the sixth night after the birth of any child, with a lamp burning through the night, and certain other articles (Every one of which becomes the perquisite of the midwife at dawn) laid out for her. Among them may be the sadle quern with its muller stone, but writing materials are always included. The goddess comes in person that night to write the fate and character of the child on its forehead in invisible but immutable words. This is brahminised as the brahmmalikhita."[৪]

এছাড়াও বারোমাসে শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে বারোটি ভিন্ন নামে ষষ্ঠীব্রত পালিত হয়। এই ষষ্ঠীব্রতগুলি আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত। অর্থাৎ একই ব্রত স্থানভেদে নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন–

১) বৈশাখ মাস: ধূলাষষ্ঠী, চন্দনষষ্ঠী, চান্দনীষষ্ঠী

২) জ্যৈষ্ঠ মাস: জামাইষষ্ঠী,অরণ্যষষ্ঠী, স্কন্দষষ্ঠী, বাটাষষ্ঠী
৩) আষাঢ় মাস: কোড়াষষ্ঠী, কদমষষ্ঠী, কার্দমীষষ্ঠী, কর্দ্দমষষ্ঠী (বিপত্তারিণী)
৪) শ্রাবণ মাস: লোটন ষষ্ঠী, লুণ্ঠনষষ্ঠী
৫) ভাদ্র মাস: মাথানীষষ্ঠী, মন্থনষষ্ঠী, চর্পটাষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, সূর্যষষ্ঠী, অক্ষয়ষষ্ঠী, সরদেশীষষ্ঠী
৬) আশ্বিন মাস: দূর্গাষষ্ঠী, বোধনষষ্ঠী,
৭) কার্তিক মাস: গোঠষষ্ঠী, নাড়ীষষ্ঠী (ছটপূজা)
৮) অগ্রহায়ণ মাস: মূলাষষ্ঠী, গুহাষষ্ঠী, মূলকষষ্ঠী, মূলকরূপিণীষষ্ঠী
৯) পৌষ মাস: পাটাইষষ্ঠী, অন্নরূপাষষ্ঠী
১০) মাঘ মাস: শীতলষষ্ঠী
১১) ফাল্গুন মাস: অশোকষষ্ঠী, গোরূপিণীষষ্ঠী
১২) চৈত্র মাস: নীলষষ্ঠী, স্কন্দষষ্ঠী

তবে কখনো কখনো একই নামের ষষ্ঠীব্রতের উদ্‌যাপনের কালটি ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন স্কন্দষষ্ঠী কোথাও জ্যৈষ্ঠমাসে পালিত হয় আবার কোথাও চৈত্রমাসে পালিত হয়। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে জ্যৈষ্ঠমাসে পালিত হয় জামাইষষ্ঠী, তাকে কোথাও বলে স্কন্দষষ্ঠী কিংবা চৈত্রমাসে হয় নীলষষ্ঠী, একেই আবার কোথাও বলে স্কন্দষষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার সরকার রচিত 'বারো মাসে তের পার্বণ ও ষষ্ঠীব্রত' শীর্ষক প্রবন্ধটির [লোক ও লৌকিক পত্রিকা] উল্লেখ করা যায়। এই প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে তেরো পার্বণ আসলে তেরোটি ষষ্ঠীব্রত। সৌরবৎসরকে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে ভাগ করলে তেরোটি মাস মেলে। তা থেকেই তেরো পার্বণ। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তিথিতে কেবলমাত্র তেরোটি ষষ্ঠীব্রতই পালনের নির্দেশ দেওয়া আছে শাস্ত্রীয় পঞ্জিকায়।

নাম বৈচিত্র্যে ষষ্ঠীব্রত পালনের বিধি: বারোমাসে যে বারোটি ষষ্ঠীব্রত পালিত হয় অঞ্চলভেদে তার নামও ভিন্ন ভিন্ন এবং এই নাম অনুযায়ী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় ব্রত পালনের বিধানের ক্ষেত্রেও। এখানে মাস অনুযায়ী এই বিষয়টি প্রাঞ্জল করে তুলে ধরা হল:

(ক) বৈশাখ মাস: বৈশাখ মাসে যে ষষ্ঠীব্রত পালন করা হয় তাকে কখনো বলা হয় ধুলাষষ্ঠী আবার কখনো বলা হয় চন্দন বা চান্দনীষষ্ঠী। এর ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা যায় যে সন্তানবতী মায়েরা এই ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেন সন্তানকে ধুলাবালি তথা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে রক্ষা করতে যাতে সে নিরোগ থাকতে পারে। এই কারণে একে ধুলাষষ্ঠী বলা হয়। অপরদিকে এই ব্রত পালন করার বিধি হল মায়েরা উপবাসে থেকে ফুল, চন্দন ইত্যাদি উপকরণে দেবীর পূজা করেন। তাই একে চন্দন বা চান্দনীষষ্ঠী বলা হয়। এক্ষেত্রে ধুলার প্রতীক (symbol / icon) রূপে চন্দনকে নির্দেশ করা যেতে পারে।

(খ) জ্যৈষ্ঠ মাস: জ্যৈষ্ঠ মাসে যে ষষ্ঠীব্রত হয় তা হল জামাইষষ্ঠী। একে অনেকে বলেন অরণ্যষষ্ঠী, আবার অনেকে বলেন বাঁটা ষষ্ঠী। এই ব্রতকে স্কন্দষষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে কোথাও কোথাও। এই ষষ্ঠীব্রতে জামাইয়ের অন্যতম ভূমিকা থাকায় একে জামাইষষ্ঠী বলা হয়। এইদিন মায়েরা জামাই-মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে আনেন ও বিভিন্ন উপাচারে জামাইকে তুষ্ট করেন। অনেক জায়গায় এইদিনে জামাইকে অর্চনার বিধি আছে। জামাই বাড়িতে পৌঁছালে পা-ধোয়ানোর ব্যবস্থা, চা, সরবত ইত্যাদি প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল, দূর্বা, আতপ চাল মাথায় দিয়ে চলে চন্দন-চর্চিত আশীর্বাদ। জামাইয়ের কপালে দেওয়া হয় চুয়া চন্দনের ফোঁটা,গায়ে মাখান হয় হলুদ,সর্বসিদ্ধি, অহলা ইত্যাদির সংমিশ্রিত তেল। তবে ইদানিং কেবল সুগন্ধ সিঞ্চনেই কাজ সারা হয়।

এইদিন জামাইকে বিশেষভাবে বরণ করার প্রথা আছে। নতুন ডালা বা বাঁটায় (পিতলের বা তামার ছোট থালাকে স্থানীয়ভাবে বাঁটা বলে) দশরকম ফল, নতুন বস্ত্র, বাঁশপাতার নিউলি (পাতার মাঝের অংশকে নিউলি বলে) দিয়ে প্রস্তুত আংটি, তালপাতার ছোট ছোট পাখা এবং তালপাতার কাঠিতে তৈরি ধনুকবাণ ইত্যাদি থাকে। জামাইবরণের এই বাঁটাটি জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপূজার প্রধান অঙ্গ। সে কারণে এই ষষ্ঠীকে বাঁটাষষ্ঠী বলে। বাঁটাষষ্ঠী নামকরণের আরও একটি কারণ আছে। জামাইষষ্ঠীর দিন জামাই পাড়ার শাশুড়িদিগের টাকা দিয়ে নমস্কার করেন। যত টাকা দিয়ে জামাই শাশুড়িকে নমস্কার করে, জামাই বাড়ি ফেরার আগে শাশুড়িগণ তার থেকে আরও কিছু বেশি

টাকা জামাইকে ফেরত দেন। এই বাড়তি টাকাকে স্থানীয়ভাবে বলে বাঁটা বা সুদ। লোকবিশ্বাস,শাশুড়িমাতাদিগের আশীর্বাদে জামাই মেয়ের ঘরে ধনসম্পদ সন্তানাদি এইভাবে বেড়ে যায়, 'আসলে' কোনদিন হাত পড়েনা অর্থাৎ অভাব অনটন থাকেনা। সুতরাং এইরূপ বাঁটা বা সুদ দেবার ব্যবস্থা আছে বলে জামাইষষ্ঠীকে বাঁটাষষ্ঠী বা বাটাষষ্ঠী বলা হয়।

বর্তমানে এই জামাইষষ্ঠীর দিনটি যেভাবে পালন করা হয় তার একটি বহু পরিচিত চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে।" এই জামাইষষ্ঠীতে বিশেষ করে শাশুড়িরই প্রাধান্য থাকে। ইদানিং শ্যালিকারাও মায়ের সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দেয়। জামাইষষ্ঠীতে ধর্মীয় আচারের চেয়ে সামাজিক রীতিনীতিই বেশি। জামাইকে পুত্রবৎ ভেবে তার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনাই এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। জামাই ও পুত্রকন্যাদের একটি হাতপাখা দিয়ে শাশুড়ি আস্তে আস্তে হাওয়া দেয়।

একটি সামান্য লৌকিক ধর্মীয় অনুষঙ্গ রয়েছে জামাইষষ্ঠীতে। জামাই শ্বশুড়বাড়িতে এলে ঐদিনে শাশুড়ি পুত্রদের সঙ্গে জামাইয়ের কপালে তেল-হলুদ ছুঁইয়ে দেয়, তারপরে হলুদে ছোপানো ছয়গাছি পাকানো সুতো বা 'ষাট সুতো' হাতে বেঁধে দেয়। পুত্রগণ ও জামাই একইভাবে অভ্যর্থিত হয়। জামাইকেও পুত্রদের সঙ্গে একই পরিবারভুক্ত ভাবা হয়।

এই অনুষ্ঠানের নানারকম রীতি প্রচলিত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এইদিনে জামাইয়ের বাড়ি অর্থাৎ মেয়ের শ্বশুড়বাড়িতে 'ষষ্ঠীর তত্ত্ব' পাঠানো হয়, ধুতি-পাঞ্জাবি-শাড়ি-আলতা-সিঁদুর-শাখা-পলা-মিষ্টি প্রভৃতি। এইসব লৌকিক অনুষ্ঠানের পর ভোজের আয়োজন করা হয়। আসলে, জামাইষষ্ঠী হল জামাই, পুত্র-কন্যা, শ্বশুর এবং শাশুড়ির বাৎসরিক মিলনের আনন্দোৎসব। বিবাহিতা মেয়েরাও আর একবার বাপের বাড়িতে আসার সুযোগ পায়"। [৫]

এই ষষ্ঠীব্রতেরই অপর নাম অরণ্যষষ্ঠী। নামটি অবশ্যই শাস্ত্রীয়। 'অরণ্য সম্বন্ধিনী (অরণ্য গমনার্ত) ষষ্ঠী'। অরণ্যষষ্ঠী নামকরণের কারণ পঞ্চস্বামী দ্রৌপদীর সহ-অবস্থানের নির্ধারিত নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী অর্জুনের অরণ্যবাসের সময় জ্যৈষ্ঠ-শুক্লাষষ্ঠীতে মণিপুরে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অরণ্যের মধ্যেই গন্ধর্ব মতে বিবাহ হয়। ঐদিনই রাজবাড়িতে মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা হয়। এই ষষ্ঠীতে স্ত্রীলোকেরা ব্যজন নিয়ে বনে ভ্রমণ করেন এবং সুপুত্র লাভের জন্য ফলমূলাহারে বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর আরাধনা করেন। এর উপকরণ হল গাছের ডাল, তালপাতার পাখা, সাতটি বাঁশের নতুন বের হওয়া শিষ, ষাট গাছি দূর্বা ও সাতটি ধান। ধানগুলো পুঁটলি করে বাঁশের শিষের সঙ্গে দূর্বাসহ বেঁধে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় বোঁটাসহ জোড়া করমচা। গাছের ডালটি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। জন সম্পদ বৃদ্ধির কারণে এই ব্রত পালিত হয়। এছাড়া সন্তানের অকালমৃত্যু বা নজর না-লাগার জন্য এই ব্রত করা হয়। ব্রত পালন হয়ে গেলে শান্তিজলের ছিটা দিতে হয়। ঝি-চাকর, গরু-বাছুর, পশু-পাখি, কর্তা-ছেলে, মেয়ে-বউ, নাতি-নাতনি প্রভৃতি সকলকে ষষ্ঠীব্রতের ঘটের জল ছিটিয়ে দিতে হয় আর মুখে বলতে হয়- 'জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট। ফিরে ঘুরে এল বাট।। বারোমাসে তের ষাট। ষাট ষাট ষাট।।' তবে আজ আর গ্রামাঞ্চলেও অরণ্যষষ্ঠীর প্রচলন দেখা যায়না। তার পরিবর্তে এই একই দিনে হয় লৌকিক জামাইষষ্ঠী উৎসব। তবে অরণ্যষষ্ঠীতে যেমন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হত, জামাইষষ্ঠীতেও তার রেশ থেকে গিয়েছে। তবে সব দিক থেকে বিচার করলে জ্যৈষ্ঠ মাসে পালিত এই ষষ্ঠীব্রতকে 'জামাইষষ্ঠী'বলাই যুক্তিযুক্ত।

(গ) আষাঢ় মাস: আষাঢ় মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে সন্তানকামনার জন্য পালন করা হয় কোড়াষষ্ঠী। এছাড়া হয় 'কার্দমীষষ্ঠী', যাকে কর্দমষষ্ঠী বা বিপত্তারিণীর ব্রত বলে। এইদিন মায়েরা দেবী ষষ্ঠীকে তেরোটি ফুল, তেরোটি ফল, তেরোটি পান, তেরোটি সুপারি, তেরোটি দূর্বা ও তেরোটি পাতা দিয়ে পূজা করেন। এর সাথে থাকে তেরোটি লুচি। পূজা শেষে ব্রতিনী একাসনে বসে ঐ তেরোটি লুচি তেলছাড়া তরকারী দিয়ে আহার করেন।

(ঘ) শ্রাবণ মাস: সন্তানের অকালমৃত্যু রোধে শ্রাবণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে পালিত হয় লোটনষষ্ঠী বা লুণ্ঠনষষ্ঠী। এই পুজোর উপকরণগুলি হল ঘি, আখের গুড়, ফল, মিষ্টি, ডাব, বাঁশের মুথুনি, বাঁশপাতা (তলতা বাঁশের পাতা), বাঁশের ছ'টি ডাল, তিনটি ঝিঙে, ভিজে ছয়রকম কলাই ইত্যাদি। এই পুজো সন্তানের মায়েরা পুরোহিতকে দিয়ে করান। এইদিন মায়েরা তালের লেই, চালের গুড়ো বা আটা দিয়ে ভাল করে মেখে তেলে ভেজে দেবী ষষ্ঠীকে নৈবেদ্য দেন। পূজা শেষে সেই নৈবেদ্য নিজে খান ও বাচ্চাদের বিতরণ করেন। পূজা শেষে ব্রতিনীগণ ব্রতকথা শোনেন এবং সাদা

সুতোয় হলুদ মাখিয়ে বাচ্চাদের হাতে ষষ্ঠীর ডুরি বেঁধে তবেই জলগ্রহণ করেন। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে এই ডুরি বাঁধার ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি বারে নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন- সোম, শনি ও শুক্র। এইদিন মায়েরা অন্নগ্রহণ করেন না এমনকি চালের তৈরি কোন জিনিসই খান না। দিনের বেলা লুচি, মিষ্টি, নিরামিষ তরকারী খাওয়া যেতে পারে আর রাত্রে ফলমূল, মিষ্টি ও ডাব খেতে হয়, অন্যকিছু নয়।

(ঙ) ভাদ্র মাস: ভাদ্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে সন্তানের ধনলাভের কামনায় মাথানীষষ্ঠী বা মন্থনষষ্ঠী পালিত হয়। এছাড়া 'চপেটীষষ্ঠী' পালিত হয়। এই পূজার স্থানীয় নাম চাপড়াষষ্ঠী বা অক্ষয়ষষ্ঠী। মায়েরা চাপড়াপিঠে করে দেবীষষ্ঠীকে পূজা দেন। চালের গুড়োর সঙ্গে পাকা তালের নোদ মিশিয়ে এই পিঠে প্রস্তুত হয়। এই পিঠে ব্রতিনী নিজে খান ও বাচ্চাদের দেন। এই ষষ্ঠীতে কলার পেটকো [কলাগাছের কান্ডের ত্বক] আর নারকেলের পাতার খিল দিয়ে নৌকো তৈরি করা হয়। নৌকোর খিল চালকুমড়োর ফুল, ঝিঙে ফুল, শশা ও দোপাটি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। এই নৌকোয় রাখা হয় পিটুলি দিয়ে তৈরি পুতুল, রিং এর মত দেখতে পিটুলির চাপড়া, তাতে সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। এইগুলি কোন পুকুর বা জলাশয়ের ধারে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা পুজো করান হয়। আতপ চাল, কাঁচা দুধ, কলা দিয়ে নৈবেদ্য তৈরি করা হয়। পূজা অন্তে তা বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পূজার পর নৌকো জলে ভাসিয়ে দেন ব্রতিনীরা এবং মুখে বলতে থাকেন- 'চাপড় যায় ভেসে/ছেলে থাকুক বেঁচে'। এরপর মায়েরা আঁচলে কলা বা ঝিঙে বেঁধে ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনবেন। ঐদিন মায়েরা লক্ষ্মী অর্থাৎ ভাত খেতে পায়না। রুটি, লুচি-পরোটা, নিরামিষ তরকারী বা ফল-মিষ্টি খেয়ে থাকেন।

(চ) আশ্বিন মাস: আশ্বিন মাসে হয় দুর্গাষষ্ঠী বা বোধনষষ্ঠী। নারীদের বিশ্বাস যে আদ্যাশক্তি দুর্গাও এদিন সন্তানকামনা করেছিলেন। ফুল, দূর্বা, দীপ, ধূপ, আতপচালের নৈবেদ্য, ফল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়ে এই ব্রত করা হয়। এইদিন সন্তানবতী মায়েরা উপবাসে থেকে পুজো করেন। পুজোর দিন ভাত বা চালের তৈরি খাবার খাওয়া যাবেনা। পুজোর পর ব্রতকথা শুনতে হবে এবং রাত্রে ফলমূল খাবে। পুজান্তে ষষ্ঠী পুজোর প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করবে।

(ছ) কার্তিক মাস: কার্তিক মাসে পালিত হয় 'নাড়ীষষ্ঠী'। খুব অল্প সংখ্যক মায়েরা এই ষষ্ঠীব্রত করেন। এছাড়া রাখাল বালকদের মায়েরা গোঠষষ্ঠী পালন করেন এই কামনায় যাতে তাদের সন্তান হাটে-মাঠে-গোঠে থাকাকালীন ভালো থাকে। অর্থাৎ বাড়ির বাইরে থেকেও তারা যেন নিরাপদে থাকে। তবে অ-বাঙালি বিশেষত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এইদিন পূজার আড়ম্বর ব্যাপক দেখা যায়। এই পূজাকে অনেকে ছট্‌পূজা বলেন। গোটা কলার কাঁদি, আম, আখ ইত্যাদি গোটা জিনিস এই পূজার উপকরণ।

(জ) অগ্রহায়ণ মাস: অগ্রহায়ণ মাসে হয় 'মূলকরূপিণীষষ্ঠী'। স্থানীয় ভাষায় একে মূলাষষ্ঠী বলে। এই ষষ্ঠী পালন করা হয় যাতে গোবৎসাদি নষ্ট না হয়। এই ষষ্ঠীব্রত পালনের বিধান হল- বাড়িতে যতজন লোক থাকে ততগুলো ঘট বসিয়ে আঙচ কলাপাতায় একুশটি পিঠে, একুশ টুকরো পাটালী, সর্ষের ফুল, মূলোর ফুল, কলমীর ডোগ, হিমচে, ওড়াধান, আউশ ধান দিয়ে দেবীকে পুজো দেওয়া হয়। এইদিন মায়েরা মূলো-ভাতে ও মুগের ডাল দিয়ে ভাত খান। অবশ্যই নিরামিষ খেতে হয়। অনেকে শুধুমাত্র পিঠে খান।

(ঝ) পৌষ মাস: সন্তানের রোগমুক্তি ও অকালমৃত্যুরোধের জন্য পৌষ মাসে নারীরা নাটাইষষ্ঠী বা পাটাইষষ্ঠী ব্রত পালন করে থাকেন। এছাড়া পৌষমাসে হয় 'অন্নরূপাষষ্ঠী' বা অন্নষষ্ঠী। প্রাচীন কৃষিলক্ষ্মীর সাথে অন্নষষ্ঠীর সম্বন্ধ আছে। এইদিন মায়েরা পায়েস-পিঠে করে দেবীকে পূজা দেন। পূজার শেষে সেই প্রসাদ নিজে খান ও সন্তানাদির মধ্যে বিতরণ করেন।

(ঞ) মাঘ মাস: মাঘ মাসে নারীরা সবকিছু শীতল বা ঠান্ডা খান কিংবা গোটা সেদ্ধ খান এবং শীতলষষ্ঠীব্রত পালন করেন। অনেকে একে গোটাষষ্ঠীও বলেন। সাধারণত সরস্বতী পূজার পরদিন হয় শীতলষষ্ঠীব্রত। এই ব্রতের ফল হল সংসার শোকতাপ মুক্ত থাকবে।

(ট) ফাল্গুন মাস: ফাল্গুন মাসে হয় 'গোরূপিণীষষ্ঠী'। গোমুন্ডে ষষ্ঠীপূজার পরিচয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। একসময় ষষ্ঠী ছিলেন ভাগাড়ের দেবী। সন্তান প্রসবের পর আঁতুড়ঘরের চালে গোমুন্ড গোঁজার বিধি এখনও বহু স্থানে প্রচলিত আছে। গোমাতা ভগবতী সম্ভবত দেবীষষ্ঠী। এছাড়াও শোক নিবারণ অর্থাৎ সন্তানের অকাল-মৃত্যুরোধে

নারীরা অশোকষষ্ঠীব্রত বা স্কন্দষষ্ঠীব্রতও করে। যদিও এই অশোকষষ্ঠী কখনো কখনো চৈত্রমাসের শুক্লষষ্ঠী তিথিতেও পালন করা হয়।

(ঠ) চৈত্র মাস: চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে স্ত্রীলোকগণ ষষ্ঠীর পূজা করেন। সকালে ষষ্ঠী মায়ের পূজা দিয়ে তবে জলগ্রহণ করেন। মায়ের ডালায় অশোকফুলের ছ'টি কুঁড়ি, ছ'টি মুগডাল ও অন্যান্য ফুলফলাদি থাকে। পূজা শেষে জলগ্রহণের পূর্বে ছ'টি অশোককুঁড়ি ও ছ'টি মুগকলাই দই দিয়ে বা পাকা কলার মধ্যে দিয়ে আলতোভাবে গালে ফেলে গিলে খাওয়ার রীতি আছে, দাঁতে লাগানো যাবেনা। এইদিন আন্নাহার চলবেনা। মায়েরা লুচি, সুজি ইত্যাদি খেয়ে থাকেন, কেউ শুধুমাত্র ফলাদি গ্রহণ করেন।

এছাড়া চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব দিন সন্তানের কল্যাণ কামনায় মায়েরা নীলষষ্ঠীব্রত পালন করেন। সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যেয় শিবের মাথায় ডাবের জল ঢেলে শিবকে প্রণাম করে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করেন ব্রতিনীরা এবং সেইসঙ্গে ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রদীপ নিবেদন করেন। এই উদ্দেশ্যে যে ছড়া আবৃত্তি করা হয় তা হল: "নীলের ঘরে দিয়ে বাতি / জল খাও গো পুত্রবতী"। চৈত্র মাসে পালিত দুটি ষষ্ঠীব্রত পালনের উদ্দেশ্য কিন্তু একটিই, সন্তানের আয়ুবৃদ্ধি তথা দীর্ঘজীবন লাভ।

বারোমাসে পালিত বারোটি ষষ্ঠীব্রত পালনের রীতি দেখে এবং ষষ্ঠীদেবীর পৌরাণিক ব্যাখ্যার কথা স্মরণে রেখে মূলত দুটি পরিচয় ষষ্ঠীদেবীর ধরা পড়ে, প্রথমত পৌরাণিক ব্যাখ্যানুযায়ী মা ষষ্ঠী মা দুর্গারই এক লৌকিক রূপ বিশেষ। সেই কারণেই আশ্বিন মাসে পালিত দুর্গাষষ্ঠী বা বোধনষষ্ঠীতে মা দুর্গার সুসন্তান (সুপুত্র) কামনার অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা সুপুত্রের জননী হওয়ার জন্য কামনা করে ষষ্ঠীব্রত পালন করেন এবং চৈত্রমাসে মা ষষ্ঠীর সাথে নীল তথা মহাদেবের পূজার্চনাও করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, মা ষষ্ঠীকে সারা বছর ধরে বারোটি মাসে যেভাবে পূজার্চনা করা হয় তাতে মনে হয় বাংলার মহিলারা দেবীকে নিজেদের ঘরের এক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না মহিলা সদস্যা, যিনি শিশুর রক্ষার কাজটি করে থাকেন, সেই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই তারা সারাবছর নিজেরা যা খান তাই বাড়ির অন্যতম সদস্যা রূপে দেবী ষষ্ঠীরও প্রাপ্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই জন্য মাকে খেতে দেওয়া হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-কাঁঠাল (জামাইষষ্ঠী), শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের তালের পিঠে (লোটনষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী), কিংবা সব্জির মধ্যে ঝিঙে-মূলো (চাপড়াষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী), পৌষ মাসের পিঠে-পায়েস (নাটাইষষ্ঠী), মাঘ মাসে পান্তাভাত আর গোটা সেদ্ধ (শীতলষষ্ঠী) ইত্যাদি। অর্থাৎ মা ষষ্ঠী এখানে দেবী হয়েও বাংলার মাতৃকুলের কাছে একান্ত আপনজন ও ঘরের সদস্যে পরিণত হয়ে উঠেছেন। তাই মধ্যবিত্ত পরিবার সারাবছর যা আহার করে মা ষষ্ঠীও তাই-ই আহার করেন আর বাড়ির প্রিয়তম শিশুটিকে সর্বদা আগলে রাখেন বলে মাতৃকুলের কাছে তিনি বড় প্রিয়, বড় আপনারজন।

ষষ্ঠীব্রতের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য: মা ষষ্ঠী লৌকিক দেবী। তাই পঞ্জিকা অনুযায়ী তাঁর ব্রত পালনের নির্দিষ্ট সময়সূচী থাকলেও ব্রত পালনের কোন নির্দিষ্ট বিধান লক্ষ্য করা যায়না। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই দেবীর পূজা বা ব্রত উদ্‌যাপন হতে দেখা যায়। কিন্তু স্থানভেদে বা অঞ্চলভেদে তার ধরণে লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্য। বিভিন্ন জেলায় ক্ষেত্রানুসন্ধান করে এই বৈচিত্র্যটি আরো স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে আমাদের কাছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

সারা বছর বাংলার সধবা মহিলারা বিভিন্ন ষষ্ঠীব্রত করে থাকেন। কিন্তু শিশু জন্মের পর সূতিকা ষষ্ঠী দিয়েই ষষ্ঠীর আরাধনা শুরু হয়। এই ষষ্ঠী পূজাও স্থানভেদে বিভিন্ন। যেমন- কোথাও এই ষষ্ঠীপূজা হয় পুকুর বা কোন জলাশয়ের ঘাটে। যেমন মেদিনীপুর জেলা বা বাঁকুড়া জেলায় আদিবাসী বা নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে এইরূপ ষষ্ঠীপূজা দেখা যায়। একে বলে ঘাটষষ্ঠী। এর পূজক দাইমা স্বয়ং। আবার কোথাও আঁতুড় ঘরের মধ্যেও ষষ্ঠীপূজা করা হয়। যেমন, হুগলী বা বাঁকুড়া জেলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় আঁতুড় ঘরের দেওয়ালে গোবর দিয়ে ষষ্ঠীমূর্তি বানানো হয় ঘুঁটে দেওয়ার মত করে। তারপর তাকে সাতটি বা ন'টি বা এগারোটি কিংবা একুশটি কড়ি দিয়ে সাজানো হয়। আবার কোথাও শুধুমাত্র আমের পল্লব দিয়ে জলপূর্ণ ঘট বসিয়েও ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়, যেমন নদিয়ার প্রায় সর্বত্র। এছাড়া ষেঠেরার রাতে আঁতুড় ঘরে শিশুর ভাগ্য লিখনের জন্য প্রদত্ত দোয়াত কলমের সাথে কোথাও থাকে কেবল নতুন বস্ত্র, মিষ্টি, লাল সুতো ইত্যাদি আবার কোথাও এর সাথে সাপের খোলস বা ইঁদুরের মাটিও রাখছে। তবে একথাও ঠিক যে শুধু স্থানভেদে নয় জাতি বা বর্ণভেদেও আছে বৈচিত্র্য। যেমন নদিয়ার শান্তিপুরের সদ্‌গোপ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে এই সাপের খোলস বা ইঁদুরের মাটির বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মা ষষ্ঠী শুধু যে হিন্দু ধর্মীয় মানুষদেরই আরাধ্যা তা নয়, মুসলিম সমাজেও কোন কোন জায়গায় ষেঠেরার রাতে শিশুর

কাছে দোয়াত-কলম ইত্যাদি রাখা বিধেয়, যেমন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস বা রোল গ্রাম কিংবা নদিয়ার নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত বেথুয়াডহরী।

এরপর আসা যাক বারোমাসে পালিত বিভিন্ন ষষ্ঠীব্রতের প্রসঙ্গে। বারো মাসে বারোটি ষষ্ঠীব্রত হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা জুড়ে। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ষষ্ঠীব্রত নিয়ে আলোচনা করা হল:

১) **জামাইষষ্ঠী:** জামাইষষ্ঠী বর্তমানে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের মা বাবার বাৎসরিক মিলনোৎসব ভিন্ন আর কিছু নয়। জামাই ও মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে এনে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেওয়া এবং এই উপলক্ষ্যে কিছুটা ভুরিভোজের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ির সবাই মিলে খানিক হৈচৈ করাটাই এখন জামাইষষ্ঠীর রেওয়াজ। তবুও কোথাও কোথাও এখনও এইদিন জামাইকে অর্চনা করা হয় বা জামাইকেও পুত্রবৎ মনে করে তার মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠিব্রতের 'ডুরি' বাঁধা হয় তার হাতে বা দইয়ের ফোঁটা দেওয়া হয় জামাইয়ের কপালে। এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলাতে। তাছাড়া এই জেলায় জামাইষষ্ঠীর দিন জামাইকে নিয়ে বেশ কিছু কৌতুক প্রচলন আছে, যেমন 'ডোমকল'। শালাজ (শালার বউ) এবং শালীরা জামাইকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে বা পাড়ায় যত জামাই আসে তাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান। শালাজ-শালীরা মিলে এক ভাঁড় দই আনে। সেই দই জামাইদের মধ্যে নিলামে তোলা হয়। যে জামাই বেশি দাম দিতে পারে, তাঁকে নিয়ে সবাই আদর করে, হৈচৈ চলে। যারা নিলামে হেরে যায় তাদের গায়ে কাদা মাখানোর জন্য হুড়োহুড়ি চলে। অবশেষে সেই দই সবাই মিলে খায়। 'ডোমকল' অনুষ্ঠান এখন আর তেমন দেখা যায়না। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ষষ্ঠীর দিন জামাইকে মধ্যাহ্নে ভাল করে খাইয়ে শেষে শালাজ বা শালীরা এঁটো (উচ্ছিষ্ট ভাত-তরকারী) জোর করে মাখিয়ে দেয়। জামাইও শালাজ ও শালীদের গায়ে এঁটো মাখিয়ে আনন্দ করে।

২) **লোটনষষ্ঠী:** বাঁকুড়া জেলায় শ্রাবণ মাসে যখন লোটনষষ্ঠী ব্রত পালিত হয় তখন মায়েরা ছোট ছোট ক্ষীরের নাড়ু তৈরি করে। এই নাড়ুগুলিকে বলে লোটন। ব্রত শেষে সাতটি বা নয়টি নাড়ু থেকে খুঁটে বাচ্চাদের জন্য মা প্রসাদ সরিয়ে রাখেন এবং বাকিটা নিজে খেয়ে ফেলেন। আর ব্রতের উপকরণের মধ্যেও নয়টি লোটন থাকে। বাড়ির গৃহিণী ন'টি নাড়ুকে গোবর মাখিয়ে মাটিতে ফেলে দেন এবং চুলের সাহায্যে শালপাতার থালায় আবার এদের তুলে রাখেন– একে বলা হয় লোটন তোলা।

৩) **চাপড়াষষ্ঠী:** নদিয়ার শান্তিপুরে ভাদ্রমাসে পালিত চাপড়াষষ্ঠীর চিত্রটি কিছুটা অন্যরকম। ব্রতিনীরা ব্রতের দিন কলার খোলা দিয়ে একটি নৌকা তৈরি করে। তাতে ছ'রকম আনাজ বা সব্জিকে চাকা চাকা করে কেটে সাজায় আর প্রতিটি সব্জিকে সাতটি টুকরো করে কাটা হয়। প্রতিটি টুকরোতে সিঁদুর এবং আতপ চাল বেটে ফোঁটা দেওয়া হয়। আর পুরো নৌকাটি জবাফুল দিয়ে সাজানো হয়। এরপর একটি কুলোর উপর সাজানো নৌকাটি বসিয়ে ষষ্ঠীতলায় নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজো করেন। সাথে আতপ চাল ও বাতাসা দিয়ে একটি নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুজোর পর নৌকাটি জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় ব্রতিনীরা মুখে বলেন– "খোলা গেল ভেসে / মানিক আসে হেসে"। এইদিন আতপ চালের সাতটি পিঠে করতে হয় এবং মা ষষ্ঠীকে দিতে হয়। চেপে চেপে এই পিঠে করা হয় বলে এই ষষ্ঠীকে বল 'চাপড়াষষ্ঠী'। পুজোর শেষে ঐ সাতটি পিঠে মাকে খেতে হয়। এরপর যে যে আনাজ বা সবজি কেটে ভাসানো হয়েছিল সেই আনাজগুলো দিয়েই একটা নিরামিষ ঝোল রান্না করা হয়, একে বলে 'ছয় আনাজের ঝোল'। এই ঝোল দিয়েই মায়েরা ভাত খান ঐদিন। চাপড়াষষ্ঠী উপলক্ষ্যে এই জেলাতেই অন্নগ্রহণের নজির লক্ষ্য করা হয়।

৪) **দুর্গাষষ্ঠী:** আশ্বিন মাসের দুর্গাষষ্ঠীতে চব্বিশ পরগণা জেলায় শাপলা ও শালুক দিয়ে মাকে পূজা দেওয়া হয় এবং সেই শাপলা ও শালুক মা ও বাচ্চারা খায়।

৫) **মূলকরূপিণীষষ্ঠী:** অগ্রহায়ণ মাসের মূলকরূপিণীষষ্ঠী বা মূলাষষ্ঠীতে চব্বিশ পরগণার ব্রতিনীরা যে বিধান মেনে ব্রতপালন করেন সেটি নিম্নরূপ:

ব্রতিনীর বাড়িতে যতজন লোক থাকেন ততগুলো ঘট বসিয়ে কলাপাতায় একুশটি পিঠে, একুশ টুকরো পাটালী, সর্ষের ফুল, মূলোর ফুল, কলমীর ডোগ, হিমচে, ওড়া ধান, আউশ ধান দিয়ে দেবীকে পূজা দেওয়া হয়। এইদিন মায়েরা মূলোভাতে ও মুগের ডাল দিয়ে ভাত খান।

৬) শীতলষষ্ঠী: চব্বিশ পরগণায় শীতলষষ্ঠীতে মায়েরা তথা প্রতিটি পরিবার সারাদিন পান্তাভাত খেয়ে থাকেন। এইদিন থাকে অরন্ধন। বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আগেরদিন রেঁধে রাখা ন'প্রকার গোটা সবজির তরকারী দিয়ে পান্তা খাওয়া হয়। এছাড়া ষষ্ঠীর পূর্বদিন অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন আলুর দম, মুড়ি খাওয়ার প্রচলন আছে।

আবার বর্ধমান জেলার চিত্রটি কিছুটা অন্যরকম। শীতলষষ্ঠীর দিন ভোরে উঠেই শুচিসম্মতভাবে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা রান্নাঘর থেকে মশলাবাটার শিলটি ধুয়ে মুছে তুলে আনেন। তারপর ঘরের মেঝেতে লক্ষ্মীদেবীর পাশেই দেওয়ালের ওপর ঠেস দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়। এক টুকরো নতুন কাপড় হলুদ গোলা জলে রাঙিয়ে শিলটি ঢেকে দেওয়া হল। তার ওপর তেল ও সিঁদুর দিয়ে কয়েকটি লম্বা দাগ টেনে দেন। শিলের পাশে কয়েকটি বিশেষ উপকরণ যেমন- একটি ছোট বাটিতে সরষের তেল, জলে গোলা হলুদ গুঁড়ো, কিছুটা দই, কয়েকটি বাঁশপাতা, একবাটি জল আর শ্যাওলা ও গুগলি। সকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এসে পূজা দিয়ে যান। তারপর মেয়েরা একে একে ষষ্ঠীদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকেন। পুজোর পর পাড়ার মেয়েরা একসাথে বসে মা শীতলষষ্ঠীর উপাখ্যান শুনবে। এদের হাতে থাকে একটি করে বাঁশপাতা এবং দই ও হলুদ গুঁড়োর মিশ্রণ। এই মহিলা মজলিসে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের স্ত্রী অথবা কন্যা কিংবা পুত্রবধু। ইনিই হলেন শীতলষষ্ঠীর উপাখ্যানের কথক।

এছাড়াও আরো কয়েকপ্রকার ষষ্ঠীব্রত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-

৭) জলষষ্ঠী: মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানার অন্তর্গত শ্রীশঙ্কর নামে এক কবির লেখা ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য থেকে জলষষ্ঠী নামে ('জলষষ্ঠী নামে মোর জগতে খ্যাত') এক ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। জলষষ্ঠীর উল্লেখ অন্য কোন কাব্য থেকে জানা যায়না। অন্য কোন জেলায় ঐ নামের ষষ্ঠীর কথা শোনা যায়না। অনুমান করা হয়েছে এই নামের ষষ্ঠী জলের ফাঁড়া থেকে শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে নদীতীরবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের সমাজে উদ্ভব হয়েছিল। তবে বর্তমানে এনামের ষষ্ঠীপুজোর কথা খুব একটা শোনা যায়না। কিছু কিছু জায়গায় শিশুর বারো বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বছর জন্মতিথিতে জলষষ্ঠীর ব্রত পালন করা হয় এবং ব্রতের দিন ষষ্ঠীমঙ্গলের গান শোনা হয়। এই গান আবার শঙ্কর রচিত জলষষ্ঠীরই গান।

৮) সরদেশী ষষ্ঠী: ভাদ্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে মেদিনীপুর জেলায় সরদেশী ষষ্ঠী পুজো হয়। পুকুরের পাড়ে বেল বা মনসা-সিজ গাছের তলায় এই দেবীর বেদী। ব্রতিনী দেবীকে আশকে পিঠে নিবেদন করেন।

৯) ষাট বা সাইটাল বা ষাইটল ব্রত: পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত উত্তরবঙ্গের কোচবিহারেও সন্তান পালনের দেবী হিসাবে পূজিত হন ষষ্ঠীদেবী। স্বাভাবিকভাবেই বিবাহিতা বা সন্তানবতী রমণীগণই এই ব্রতের প্রধান ব্রতিনী। অনেকস্থানে সোম ও শনিবার ষষ্ঠীপূজা করায় মানা আছে। জ্যৈষ্ঠমাস এই ব্রতের শ্রেষ্ঠ সময়। কোচবিহারের বেশিরভাগ গ্রামে পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠী তিথিতেই এই পূজার প্রচলন বেশি। এই পূজার মুল উপকরণ তিনকুড়ি তিনটি দূর্বা, ছয়কুড়ি ছয়টি করঞ্চা এবং আমের পল্লব। এই তিনটি বস্তুকে একত্রে কলার ফাত্রা দিয়ে পেঁচিয়ে গুছি বা শেকড় তৈরি হয়। প্রত্যেক ব্রতিনী ব্রতকথা শোনার সময় এই গুছি হাতে নিয়ে বসে ব্রতকথা শোনেন। ব্রতিনীগণ পূজার দিন সকালবেলা আম, কলা ও গুছি সহকারে নতুন শীতলপাখাতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে নদীতে বা পুকুরে স্নান করে এসে বাড়ির ছোট বড় সবাইকে ষাট বা আশীর্বাদ দেন। স্নান করে এসে ব্রতিনীগণ বাড়ির বড় ঘরে ঘট বসিয়ে কলার মাইচ পাতায় ফলমূল ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পুরোহিতের মাধ্যমে পূজা করেন। অনেকে আবার ঘরে কাঁঠালগাছের ডাল পুঁতে পিটুলির ষষ্ঠীমূর্তি তৈরি করেও পূজা দেন। ব্রতপূজার সমাপ্তে ব্রতকথা শোনার রীতি আছে।

এছাড়া কোচবিহার জেলার রাজবংশীদের মধ্যে যে ষষ্ঠীব্রত দেখা যায় তাকেই স্থানীয় ভাষায় বলে সাইটোল বা সাইটোর বা ষাইটল ব্রত। রাজবংশী রমণীগণ যেভাবে এই ব্রত পালন করেন তার চিত্রটি কিছুটা নিম্নরূপ:

ষাইটোল বা ষষ্ঠী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে আমরা পাই ষষ্ঠী- সটবী- সাটি- সাইট + অব +অন সাইটর, সাইটোল। ষষ্ঠী থেকে সাইটোল শব্দের উৎপত্তি। কাগজ ও শোলার মঞ্জুষা মূর্তিতে সাধারণত এই দেবীর পূজা হয়। ঢাকের বাজনা এই

পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না, বাড়ির কর্ত্রী নিজেই এই পূজা করেন। ফল, মুল, বাতাসা, খই, চিঁড়ে, দুধ, দই, মুড়ি, মুড়কি, চিনি, কলার ভোগ ইত্যাদি উপকরণসহ ব্রতকথার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

সাধারণত পৌষ-মাঘ মাসে নিঃসন্তান রাজবংশী রমণীগণ সন্তান কামনায় এই ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন। যার বাড়ীতে এই পূজা হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় মারেয়া বলে। মেয়েরাই এই পূজার মুল ব্রতী, দুজন বৈরাতীও থাকে। সাইটোল পূজায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একজন গিদালী থাকেন, যার পরিচালনায় সাইটোল পূজার গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গিদালীর দলে পাঁচ-ছয়জন দোহারও থাকেন। পূজা ও নৃত্যের সময় 'চাইলন বাতি' বৈরাতী বা মারেয়ার স্ত্রীর হাতে থাকে। দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ষষ্ঠীদেবী উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের সাইটোল মূলত প্রজননের দেবী। পূজান্তে গিদালীর নেতৃত্বে লোকগীতি পরিবেশনের রেওয়াজ আছে। এই পূজায় পূজার দিন স্থির করার পরেই মারেয়া ঢাকের বায়না দেন, যার দৃষ্টান্ত এই ব্রতের গানে দেখা যায়- "আমার বাড়ী সাইটোল পূজা, ঢাকের বায়না দে"।[৬] তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ১নং অঞ্চলের মাছুয়াটারী গ্রামের সাইটোল ব্রতের ঘটবসানী গানে সন্তান কামনার আর্তি ফুটে ওঠে:

"সাইটোল মাও সাইটোল মাও
তুই আসিনু আমার ঘরে
তোরে বরে মা পুত্র পাইলাম কোলে
তোক বানেয়া আইনলোং মা মালাকারের ঘরে
পূজা খাবার বইসেক মা তুই আমার ঘরে"।[৭]

কোচবিহারে সাইটোল ব্রত পূজার প্রধান অঙ্গ হল এর গান। ব্রতকথাই এখানে গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। সন্তান কামনাই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। তাই এর নির্দিষ্ট সময় বা তিথির ধার ধারেননা অনেকে। নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সাইটোল পূজার লোকাচার জেলার কোন কোন গ্রামে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত আছে। নাচ-গানই যেহেতু এর প্রধান আঙ্গিক তাই এর মাধ্যমেই অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি পবিত্রতার প্রকাশ ঘটে। নাচের তালে তালে মেয়েরা যে গান গায় তার মূল কথা হল:

"হে দেবী কি দিয়ে তোমার বন্দনা করি বল?
ফল পাখীতে ও বাঁদরে খায়।
দুধ মানুষে ও বাছুরে খায়।
চিনি বা গুড় পিঁপড়েতে খায়।
কি দিয়ে তোমার পূজো করি বল?
বনের ফুল দিয়েই তোমার পূজো করি মা"।[৮]

কোচবিহারের সাইটোল, রঙপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে ষাইটোর নামেও পরিচিত। আঞ্চলিক লোকভাষায় ষষ্ঠীদেবীকেই ষাইটোর এবং সাইটোল বলা হয়।

কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে বিষহরি পূজার অনুষঙ্গেও সাইটোল দেবীর প্রসঙ্গের কথা শোনা যায়। মাথাভাঙ্গার শিকারপুর ও তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ী গ্রামে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে বিয়ের পূর্বে বিষহরির প্রচলিত গানে ষাইটোল বিষহরির গান করে থাকে। উক্ত গ্রামে প্রচলিত কিংবদন্তী হল- "সাইটোল দেবী বিষহরির কৃপায় সন্তানবতী হয়েছিলেন। সেই সন্তানের বিয়ের সময় দেবী বিষহরির পূজা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন বলে অধিবাসকালে তাদের মৃত্যু হয়। পরে বিষহরির আশীর্বাদেই তারা পুনর্জন্ম লাভ করে"।[৯] এই সাইটোল বা সাইটোন জেলার অন্যতম প্রভাবশালী লৌকিক গৃহদেবী। জেলার দিনহাটা মহকুমার কিসমতদশ গ্রামের রাজবংশী সমাজে সাইটোল দেবীর শোলার মঞ্জুষা পূজার সময় গিদালীগণ শোলার জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করে ষাইটোল মায়ের বন্দনা করেন। যেমন-

"এক হাঁটু জলোতে তোক শোলা কাটুনু
তোক শোলক মুই রইদোতে শুকানু রে-এ"।[১০]

এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে নাচে গানে ভক্তিতে সারাবছর ব্যাপী ষষ্ঠীব্রত বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। ব্রতের পালনরীতিতে বৈচিত্র্য থাকলেও অন্তরের মর্মকথা সেই একসুরেই বেজে ওঠে- 'সন্তানের রক্ষয়িত্রী ও সন্তানদায়িনী দেবী মা ষষ্ঠী'।

প্রসঙ্গ ষষ্ঠীব্রত কথা: যেকোন ব্রত উদ্‌যাপনের অন্যতম অঙ্গ হল সেই ব্রতের ব্রতকথা শ্রবণ। ষষ্ঠীব্রতও এর ব্যতিক্রম নয়। বারো মাসে যে বারোটি ষষ্ঠীব্রত পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সর্বত্রই কিন্তু ব্রত বা পূজা শেষে ব্রতকথা শ্রবণ অপরিহার্য। এ ব্যতিত ব্রত পালন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কখনো কখনো সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে ব্রতকথা শোনার বিধান আছে ষষ্ঠীব্রতে। তবে সবসময় যে একই ব্রতকথা শোনা হয় তা নয়। কারণ একই ষষ্ঠীব্রতের জন্য দুটি বা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রতকথার প্রচলন আছে। অর্থাৎ ব্রতকথার মধ্যে পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। আলোচনার প্রসঙ্গ সূত্রে এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাঘ মাসে পালিত শীতলষষ্ঠীর ব্রতকথা ও তার পাঠান্তরটি তুলে ধরা হল–

> " এক ছিল শীতুলী বাম্‌নী তার সাত ছেলে, সাত বৌ, ঘরকন্না করে। মাঘ মাস, বড্ড শীত। বামনী শেতলষষ্ঠী কর্ব্বে বলে দই পেতে শিকেয় তুলে রাখেছে, সকাল বেলা উঠে বামনীর পূজোর কথা আর মনে নেই। সে বউদের বললে আজ বড় শীত, আমায় গরম জল করে দাও, আমি নাইবো। মাগুর মাছের ঝোল, মুগের পুলি আর গরম ভাত আমায় রেঁধে দাও, আমি খাবো। বৌয়েরা তাই করে দিলে, খেয়ে দেয়ে বামনী যেই উঠতে যাবে অমনি শিকেতে দয়ের হাঁড়ি ছিল মাথায় ঠেকল। তখন বামনীর পূজোর কথা মনে পড়ল, কি আর কর্বে, সেদিন লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। বৌয়েরাও খেয়েদেয়ে শুল। সকালবেলা বামনী উঠে দেখে অনেক বেলা হয়ে গেছে, তখনও কেউ ওঠেনি। এ দোরে ঘা মারে, ও দোরে ঘা মারে কোন সাড়া শব্দ পেলেনা। তখন পাড়ার লোকজন ডেকে এনে দরজা ভেঙ্গে দেখে সাত ছেলে সাত বৌ মরে রয়েছে। এমনকি বাড়ির বেড়াল, কুকুরটা পর্যন্ত যে যেখানে পড়েছে, সেখানে মরেছে। তখন বামনী মনে মনে ভাবলে যে এ নিশ্চয়ই মা ষষ্ঠীর ছলনা। যেখানে মা ষষ্ঠীর দেখা পাব, সেখানে যাবো। একটা অরণ্য বিজিবনের ভেতর গিয়ে খুব কাঁদতে লাগল আর মা ষষ্ঠীকে ডাকতে লাগল। হে মা ষষ্ঠী আমার কি অপরাধে এমন করলে মা! এমন সময় দেখলে একটি বুড়ি এসে বলছে, এই বনের ভেতর বসে কেন তুমি কাঁদছ মা! বামনী সব বললে। এই কথা শুনে বুড়ি একটু হেসে বললে, তার আর কি হয়েছে, বাড়ী যাও, গরম গরম মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাও। লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকোগে। এই কথা শুনে বামনী বললে- আমি কল্লুম কোণে, তুমি কি করে জানলে বনে। তবে তুমিই মা ষষ্ঠী। হে মা ষষ্ঠী দয়া কর বলে কেঁদে পড়ল। মা ষষ্ঠী বললেন তুই এক কাজ কর। বাড়ী গিয়ে দেখবি তোর ঘরের পেছনে একটা বেড়াল মরে পচে আছে। গায়ে পোকা বিড়বিড় কচ্চে। তুই এক ছোবা দই দিয়ে, সেই বেড়ালটির গায়ে ঢেলে দিয়ে, ফের জিভ দিয়ে চেটে তুলে, এক ভাঁড় বোঝাই কর। আর আমি এই অমৃত কুন্ডের জল দিচ্চি, তাদের গায়ে ছড়িয়ে দিবি, তা হলেই সকলে বেঁচে উঠবে। বামনী ফিরে গিয়ে দেখলে একটা মরা বেড়াল রয়েছে, তাড়াতাড়ি তার গায়ে এক ছোবা দই ঢেলে দিয়ে চেটে তুলে এক ভাঁড় করলে, তারপর অমৃত কুন্ডর জল নিয়ে তাদের গায়ে ছড়িয়ে দিলে, অমনি সকলে বেঁচে উঠল। উঠে বললে এত বেলা হয়ে গেছে, আমাদের কেউ ডাকনি? তখন বামনী তাদের সব ব্যাপার খুলে বললে, তারা শুনে মর্ত্যলোকে পূজোর প্রচার করে দিলে, যে এ ব্রত করে, তার কখন কোন অনিষ্ট হয়না।"[১১]

এই ব্রতকথাটির পাঠান্তর পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলায়। কাহিনিটি হল–

> "বামে বন, ডাইনে বন। চারিধারেই বন। এ-বন থেকে ও-বন ঘোরাফেরা করছে বাঘ ভালুক নেকড়ে শিয়াল। গাছে গাছে উড়ে এসে বসে চিল শকুনি। আমরা বেঁচে আছি মা ষষ্ঠীর দয়ায়। এই ষষ্ঠী মায়ের কাছে মানত করে ষাটুর মায়ের পেটে ষাটুর জন্ম। বাপ মায়ের চোখের মণি ষাটু। সেই ষাটুর একদিন বিয়া হল। ষাটু গেল শ্বশুরবাড়ি। এরপর সে পোয়াতি হল এবং ক্রমশ ষাটুর প্রসবের সময় হল। ঘরের পাশেই বন। ষাটু নির্ভয়ে গাছপালা পাখপাখালি দেখতে দেখতেই প্রসব করল একটা মস্ত বড় লাউ। লাউটি দেখেই সে শাশুড়ির কাছে চলে এল। শাশুড়ি বৌয়ের পেটের দিকে চেয়ে বলল, একি বৌ, তুই জাঁড় (জঠর বা গর্ভ) পেটে গেলি আর তুঁড় (ভাঙ্গা) পেটে এলি যে। ষাটু বলল, ওই ধারে দ্যাখো যেয়ে একটা লাউ হয়েছে। শাশুড়ি ছুটে গিয়ে দ্যাখে, মস্ত বড় একটা লাউ শঙ্খচিলে ঠোকরাচ্ছে। ঠোকর খেয়ে লাউটি গেল দুভাগ হয়ে। শাশুড়ি দেখল লাউ-এর ভিতর টুকটুকে সুন্দর ব্যাটা ছেলে। একটা নয়, দুটো নয়। গুণে দেখল ষাটটি ছেলে। মা ষষ্ঠীর দয়ায় ষাটু হল ষাট বেটার মা। মা ঠাকুমার যত্নে ষাট ছেলে জোয়ান হল। বিয়ে দিবার বয়স হল। ষাটু বলল, আমি একই দিনে যে মায়ের ষাটটি মেয়ে সেই মায়ের মেয়েগুলিকে বউ করব। কিন্তু ষাট ষাটটি মেয়ে কোথায় পাবে ষাটুর সোয়ামী? তবু বেড়িয়ে পড়ল বনের পথে। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে মা ষষ্ঠীর নাম জপ করে, শেষতক একদিন ভর্তি দুপুরে একটি পুকুরের কাছে বটগাছের তলায় এসে বসে। ঠিক সেই সময়ে অনেকগুলি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে তাদের মা এসে নামল সেই পুকুরে। ষাটুর

সোয়ামীর আশা জাগল মনে। সে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল, তাদের মা একেকটি মেয়েকে সিনান করিয়ে পাড়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। এদিকে প্রতিটি মেয়ের জন্য ষাটুর সোয়ামী একটি একটি করে পাথর জড় করে। সব মেয়ের সিনান সাঙ্গ হলে সে গুণে দেখে তার জড় করা পাথরের সংখ্যাও ষাট। ঘরে এসে ষাটুকে সুখবরটা দিতেই ষাটু সোয়ামীকে নিয়ে ষাট মেয়ের মা বাবার কাছে গেল। সাধ আহ্লাদ হল। ষাটু ষাটখানি পালকি গড়িয়ে ষাট ছেলেকে পাঠাল বিয়ে করতে। ষাট পালকিতে চড়ে ষাট ছেলে ষাট বউ নিয়ে ঘরে ফিরল। ষাটুর শাশুড়ি তো অবাক। ষাটু একাই ষাট বউকে বরণ করে ঘরে তুলল। ষাটুর আদর দেখে কে। তার ষাট বেটা ষাট বৌ। শরীরে মনে কোন দুঃখ কষ্ট নাই। নিশ্চিন্তে সুখে সে ষষ্ঠীর ব্রত, ষষ্ঠীর মানত নিয়ম ভুলে গেল। জন্ম থেকেই সে বাসি পান্তা অন্ন খেয়ে বড় হয়েছে, মা হয়েছে। ষষ্ঠীর আদেশে সারাজীবন ষাটুকে বাসি পান্তা শীতল অন্ন খেতে হবে। সুখের দিনে ষাটু সে-সব ভুলে গিয়ে শীতলা ষষ্ঠীর দিনে বৌদের বলল, আমাকে গরম গরম লুচি ভেজে দে। মাগুর মাছের ঝোল খেতে ইচ্ছে হইছে আর নিধুঁয়া কাঠের আগুন করে দে। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে গেল, আজ তো শীতলা ষষ্ঠীর দিন। কাজেই লুচি আর মাগুর মাছের ঝোল খাওয়া হলনা। ষাটুর মা যে মা ষষ্ঠীর কাছে মানত করে ষাটুকে পেয়েছিল, পুরুত ঠাকুর ষাটুর মাকে সারা জীবন ষাটুকে বাসি শীতল অন্ন খাবার নির্দেশ দিয়েছিল। ষাটু তা ভুলেই গেছল। তবে ষাটু শুধু মনেই করেছিল, খায়নি। মনের সাধ মনে চেপে দিল। তাতেই সকালে উঠেই দেখল, তার ষাট ছেলে আর ষাট বৌ মরে পড়ে আছে। মরেছে হেঁসেল ঘরে বিড়ালটা আর ঘরের দুয়ারে কুকুরটাও। ষাটু কেঁদে কেঁদে ছুটল মা ষষ্ঠীর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়ল একজন এলোকেশী মা জননীকে। ষাটু ভাবল,এই তো মা ষষ্ঠী। আছড়ে পড়ল তার পায়ে। সে বলল, "আমি মা ষষ্ঠীর ভগ্নী। তুই আরও পশ্চিমে যা, তার দেখা পাবি"। সে গেল পশ্চিমে। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ভয়ংকরী নারীমূর্ত্তি। সারা অঙ্গে তার কুষ্ঠ রোগ, দগদগে রক্তমুখো ঘায়ে ভর্তি। ষাটু বলল, " কে মা তুমি"? "কে আবার আমি? যা গরম গরম লুচি মাগুর মাছের ঝোল খা গা যা। নিধুঁয়া কাঠের আগুন পোহাগে যা"। তখনি ষাটু বুঝতে পারল, ইনিই তাহলে মা ষষ্ঠী। ষষ্ঠী বলল, "এক হাঁড়ি দই নিয়ে আমার মাথায় ঢেলে দে। আমার সারা অঙ্গ দিয়ে সেই দই বেয়ে আসুক। তুই জিভ দিয়ে চেটে চেটে সেই দই তুলে নিয়ে আমার অঙ্গ পরিষ্কার করে দে"। ঠিক সেই সময়ে এক দইওয়ালা দই ভর্তি হাঁড়ি নিয়ে ঐপথ দিয়ে চলেছিল। ষাটু সেই দই নিয়ে ষষ্ঠীর অঙ্গসেবা করল তার আদেশ মত। মা ষষ্ঠী আসল রূপে দেখা দিল। ষষ্ঠীর গায়ের ধোয়া দই ঘরে এনে তার ষাট ছেলে ষাট বৌ এবং কুকুর বিড়ালের গায়ে ছিটিয়ে দিল ষাটু আর তার ঘর ভর্তি সংসার আবার ফিরে পেল"।[১২]

এইরকম ষষ্ঠীর ব্রতকথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং বারোমাসের বারোটি ষষ্ঠীব্রতেরই পৃথক পৃথক ব্রতকথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে বিভিন্ন ষষ্ঠীব্রতকথাগুলি পাঠ করলে একটি প্রশ্ন বারবার উঠে আসে যে ষষ্ঠীব্রতের ব্রতকথার সর্বত্রই ষষ্ঠী হচ্ছেন বুড়ি- 'ষষ্ঠীবুড়ি', দ্রষ্টব্য নীলষষ্ঠী, শীতলষষ্ঠী, অরণ্যষষ্ঠী, লোটনষষ্ঠী ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ষষ্ঠী বুড়ি বামনীর ছদ্মবেশে হাজির হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল ষষ্ঠীর কেন এমন বৃদ্ধার বেশ? এর উত্তর সন্ধান করলে বলা যায়, ষষ্ঠীকে প্রাচীনতম দেবী বলে মনে করা হয়। কারণ প্রজনন চিন্তার সঙ্গে পশুপালনমূলক জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ, লৌকিক ব্রতকথা বা পৌরাণিক কাহিনীতে দেবীরা প্রায় সকলেই উদ্ভিন্নযৌবনা এবং অলোকসামান্য রূপবতী, ব্যতিক্রমী ষষ্ঠীদেবী। তিনি যখনই লৌকিক ব্রতকথায় ভক্তের কাছে আসেন তখন তাঁর রূপ অতি বৃদ্ধার। এই বার্ধক্যই তাঁর পূজার বয়স নির্ণয় করতে সক্ষম। বাংলায় ব্রতকথায় ইনি বৃদ্ধারূপে কল্পিত হলেও পুরোহিত শাসিত পূজাপদ্ধতিতে ইনিই আবার গৌরবর্ণা যুবতী হয়েছেন আর্যায়ণ ও প্রজননের দিক থেকে। ইউরোপে বা মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে এই দেবী-কল্পনার উদ্ভব বলে মনে করা হয় সেখানে মানবায়নের যুগে তিনি নবীনা, কিন্তু আমাদের দেশে যখন তাঁর পূজা প্রচলিত হলো তখন থেকেই তিনি অতিবৃদ্ধা।

এছাড়া জীব-বিজ্ঞানের অন্য আর একটি তথ্যের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। বিড়াল-জাতীয় (Cat-Group) বন্য প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে আছে hyena, civet, lion, tiger, leopard, jaguar, panthera। এরা পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য, দঃ ইউরোপ ও ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে এদের লীলাভূমি বলা যায়। সেদিক থেকেও এই দেবীর উদ্ভব মধ্যপ্রাচ্যেই হওয়া সম্ভব, বাংলার এই পরিবেশে নয়। অতএব সমস্ত ষষ্ঠীব্রতে এঁর বৃদ্ধার রূপ নেওয়ার কারণ ইনি অপরাপর সমস্ত ব্রতের লৌকিক দেবীগণ অপেক্ষা প্রাচীনতমা।

সাহিত্যে ষষ্ঠী প্রসঙ্গ: বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থাদিতে দেবী ষষ্ঠীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। পৌরাণিক দেবদেবীর মত লৌকিক দেবী ষষ্ঠীও বহু সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার খোরাক জুগিয়েছেন। তবে ষষ্ঠীব্রতের খুঁটিনাটি সব থেকে বেশি করে চোখে পড়ে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে। যেমন, এই ব্রতের পালন ও তার ফল সম্পর্কে ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যে বলা হয়েছে:

"দূর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ।।
কার্ত্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী পূজে বরবর জুড়ি।
শ্মশান হইতে পুত্র আইসে বাহুড়ি।।
বারমাসে বার ষষ্ঠী যেবা নারী করে।
রোগ শোক দুঃখ কভু নাই ক্ষিতি তলে।।"[১৩]

বিভিন্ন ষষ্ঠীব্রতে কিছু বিধি নিষেধ লক্ষণীয়। যেমন, সন্তান জন্মাবার পরে ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা করার রীতির প্রচলন আছে। সেইদিন আঁতুড়ঘরে সন্তানের শোবার জায়গায় লেখার সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস যে ঐদিন সন্তানের কপালে ভাগ্যলিপি লিখে রেখে যান চিত্রগুপ্ত। তাই সেদিন রাত্রে প্রসূতি ও ধাত্রী ছাড়া অন্যের আঁতুড়ঘরে প্রবেশ নিষেধ। যেমন মনসামঙ্গলকাব্যে এই নিষেধের প্রসঙ্গ আছে-

"সনকা সুন্দরী ষষ্ঠী পূজা করি
যাহার যে নীত আছে।
হাতে খড়্গ লৈয়া রহিল জাগিয়া
মসীপত্র থুয়্যা কাছে।।"[১৪]

আবার অরণ্য বা জামাইষষ্ঠী পালনে কিছু বাধা নিষেধ আছে। এই ব্রতে সন্তান ও জামাতার সুখ-সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। এই ব্রত পালন করার সময় ব্রতীর আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ একথা কৃষ্ণরাম দাসও বলেছেন তাঁর গ্রন্থে-

"অদ্য যে অরণ্যষষ্ঠী বিদিত সংসার।
আমিষ ভোজন কর দেখি কদাকার।।"[১৫]

প্রাচীন কাল থেকেই 'ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য' ব্রতকথা রূপে প্রচলিত। ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের ব্রতকথা অংশটি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা ভিন্নরূপে প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের ব্রতকথায়, নোলা দোষে দুষ্ট এক কনিষ্ঠা বধূ ষষ্ঠীমা'র কৃপায় নিখোঁজ ছয় সন্তানকে খুঁজে পায়। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রতকথায় এক ব্রাহ্মণীর লোভী পুত্রবধূ ষষ্ঠীব্রতের ভোগ খেয়ে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হল তার কাহিনী আছে। পুত্রবধূ শাশুড়ীর অগোচরে ব্রতের ভোগ খেয়ে ফেলল আর অমনি শুরু হল নানা দৈব বিপর্যয়: "দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণীর সংসারে অঘটন ঘটিয়া গেল। পুত্রবধূ অসময়ে মৃত সন্তান প্রসব করিল, গোরুতে বচ্ (গর্ত) ফেলিল, কুকুরে বচ্ ফেলিল, বিড়ালে বচ্ ফেলিল, কলাছড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল।"[১৬]

এই অঘটন ছয় বছর পর্যন্ত ঘটল। পরে একদিন ধরা পড়ল পুত্রবধূ ষাট-চোরণী। আবার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে বহু দুঃখ কষ্টের পর যমের সেবা করে ছোটবউ পুত্রবতী হল। পুত্রের নাম হল 'ষাঠীর গোবিন্দ'। ষাট-চোরণী যমের মা'র সকল ফন্দী কৌশলে জিতে নিয়ে মা ষষ্ঠীর বরে পেল 'ষাটীর গোবিন্দ' ও তার অন্য ছয় পুত্রকে।

কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের' ব্রতকাহিনীটি এইভাবে অঞ্চলবিশেষে কাহিনীগত এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এটি পুরোপুরি ব্রতকথার রীতিসম্মত কাহিনী।

ষষ্ঠীব্রত পালন করার কিছু নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। সোমবার এবং শনিবারদিন ষষ্ঠী পড়লে সেদিন ষষ্ঠীর পূজা করা হয়না, করলে ব্রতীর ক্ষতি হয়। তাই কেবলমাত্র আচার-নিয়ম পালন করে ব্রতকথা পাঠ করা বা শোনা হয়। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণরাম দাস বলেছেন:

"সোমবারে ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।
সেদিন কেবল পূজা হবে স্বর্গবাসে।।
পৃথিবী পাতালে পূজা নহে সেইদিন।
কেহ যদি করে পূজা নবে পুত্রহীন।।

যেই মাসে শনিবারে ষষ্ঠী তিথি হবে।
কেবল পাতালে পূজা অন্য ঠাঁই নবে।।
রবি শুক্র পূজ পূজ বুধবার বৃহস্পতি।
পৃথিবীতে পূজিবে যতেক পুত্রবতী।।"[১৭]

আবার ষষ্ঠীব্রত পালনের রীতি সম্পর্কে ধর্মমঙ্গলকাব্যে মাণিকরাম গাঙ্গুলি বলেছেন:

"ষষ্ঠীপূজা করিতে চলিল যত মেয়্যা।
চারিভার গঙ্গাজল চারি কান্দি কলা।।
চন্দ্রনাড়ু চন্দন চাঁপার চাঁদমালা।
নানা রস সংযোগে নৈবেদ্য নিরাকর।
সেবিয়া ষষ্ঠীর পদ সভে মাগে বর।।
ঝিয়ে পোয়ে কল্যাণ করিবে ষষ্ঠী বুড়ি।
ন'খানি হরিদ্রা দিব নয় কড়া কড়ি।।
কেহ বলে ঝাড়া বাড়া দিব চাঁদমালা।
মরণ করায় ষষ্ঠী দিয় নাই জ্বালা।।
দিন রাত্রি দশ ছেল্যা দুয়্যা খায় গায়।
ছেলেকে আমার সাধ আর নাঞি যায়।।"[১৮]

এইভাবে ষষ্ঠী প্রসঙ্গ বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্য লিখেছেন ষষ্ঠীপূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমরা মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় কবি শঙ্করের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য থেকে ষষ্ঠীপূজা তথা জলষষ্ঠী পূজার বর্ণনা পাই। এটি একটি আদিম ব্রত পরে শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত। তবে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে দেবী ষষ্ঠীকে পৌরাণিক দেবী বলে মত প্রকাশ করেছেন। শ্রীমতি আশা দাস তাঁর গবেষণা পত্র 'বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে উত্তরভারত ও নেপালে পূজিতা হারীতি দেবীর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর একটি সংযোগ লক্ষ্য করেছেন। দীনেন্দ্রকুমার সরকার 'লোক ও লৌকিক পত্রিকা'য় তাঁর প্রবন্ধ 'বারো মাসে তের পার্বণ ও ষষ্ঠীব্রত'তে জানিয়েছেন যে তেরো পার্বণ আসলে তেরোটি ষষ্ঠীব্রত এবং সে প্রসঙ্গে তিনি যথাযথ ব্যাখ্যাও দান করেছেন যা ইতিপূর্বেই আমার এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছ

শুধু বিদ্বজ্জন সমৃদ্ধ সাহিত্যই নয় শিশুদের দেবী ষষ্ঠী কিন্তু শিশুসাহিত্যেও ঠাঁই করে নিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লোকবিশ্বাস ও ষষ্ঠীদেবী: দেবী ষষ্ঠী সন্তানদাত্রী ও সন্তান-রক্ষয়িত্রী দেবী বলেই বঙ্গ জননীদের দেবী ষষ্ঠীর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। এ প্রসঙ্গে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় কোনো এক নামবিহীন রচনাতে বলা হয়েছিল- "বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রেই ষষ্ঠীর ভক্ত। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসিনী পুত্রবতী নারী ষষ্ঠীর অবমাননা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহাদের বিশ্বাস ষষ্ঠী কুপিতা হইলে পুত্রের ও কন্যার অমঙ্গল হয় এবং ষষ্ঠী বালক বালিকাগণের পালয়িত্রী দেবতা। বালক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলে ষষ্ঠী রক্ষা করেন, ঘুমাইলে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন। কোনও বিপদ হইতে দেননা। এই বিশ্বাসে বশীভূত হইয়া পুত্রবতী হিন্দু রমণী যাবজ্জীবন ষষ্ঠীপূজার ও ষষ্ঠীব্রত কাল যাপন করিতে পরাঙ্মুখী নহেন।"[১৯] আর এই বিশ্বাসেই কেউ শিশু সম্পর্কে কোনো অশুভ, অমঙ্গলজনক কথা উচ্চারণ করলে তা যাতে না ফলে, সেই জন্য দেবী ষষ্ঠীর নাম উচ্চারণ করা হয়। এই ষষ্ঠী দেবীই উচ্চারণের সুবিধার্থে 'ষাট ষাট' (কখনো বা 'বালাই ষাট') রূপে উচ্চারিত হয়। মূলত শিশু বিষম খেলে বা তার মৃত্যুজনিত অমঙ্গলজনক কথায় এই কথাগুলি বেশি উচ্চারিত হতে দেখা যায়। এছাড়া ষষ্ঠীব্রত পালনের ক্ষেত্রে সোম বা শনিবার অশুভজনক বলেও অঞ্চলভেদে লোকবিশ্বাস আছে।

ষষ্ঠীব্রত ও নামকরণ প্রসঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ষষ্ঠীদেবী শুধু পূজিতাই হননা, শিশুর রক্ষার্থে তিনি এতই প্রভাবশালী যে অভিভাবকেরা সন্তানের নামকরণই করছেন তাঁর নামে। যেমন 'ষষ্ঠীচরণ' বা 'ষষ্ঠীপদ' ইত্যাদি। হয়তো এক্ষেত্রে বিশ্বাস থাকে যে দেবীর নামে নামকরণ করলে তিনি সর্বদা শিশুকে রক্ষা করবেন। মূলত, দেবী ষষ্ঠীর কাছে মানত করে বা ষষ্ঠীর 'দোর ধরে' যে সন্তান জন্মায় তাদের ক্ষেত্রেই এইরকম নামকরণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু ব্যক্তিনামই নয় মা ষষ্ঠীর

নামানুসারে গ্রামের নামও মেলে যেমন, 'ষষ্ঠীপুর' বা 'ষষ্ঠীতলা' ইত্যাদি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামের গ্রামদেবী হলেন মা ষষ্ঠী। এছাড়া প্রতিটি গ্রামেই 'ষষ্ঠীথান' বলে একটি নির্দিষ্ট জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। এই থানগুলি সাধারণত কোন গাছ, বিশেষত বট, অশ্বত্থ কিংবা মনসা বা সিজ গাছের নীচেই লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠীব্রত ও বৃক্ষপূজা: ষষ্ঠীব্রতের সাথে বৃক্ষপূজার এক নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। কারণ ষষ্ঠীপূজাকে উপলক্ষ্য করে বৃক্ষকেন্দ্রিক বহুরকম উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, ষষ্ঠীব্রত অনেক সময়েই কাঁঠাল বা বটগাছের ডাল পুঁতে করা হয়ে থাকে। এছাড়া ষষ্ঠীপূজার অন্যতম উপাচারগুলি হল দূর্বা, বাঁশের কিশলয় বা কোড়া, করঞ্চা, আমের পল্লব, মূলো, ঝিঙে ইত্যাদি। এই সব কিছুই অরণ্যজীবনের অনুষঙ্গ। শুধু তাই নয়, গ্রামের ষষ্ঠীথানগুলিও গাছের নীচেই হয়ে থাকে, মূলত নিম, বট, অশ্বত্থ কিংবা মনসা বা সিজগাছের নীচে। দেবী ষষ্ঠীর রূপ কল্পনা করে লোকসমাজের মাতৃকুল সেই বৃক্ষেরই পূজা করে চলেছে মনের ভক্তিতে,সন্তানের মঙ্গলকামনায়।

ষষ্ঠীব্রতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য: পশ্চিমবঙ্গের ষষ্ঠীব্রতগুলি বিশ্লেষণ করলে তার ভিতর থেকে একটা সুবিন্যস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই ব্রতগুলি মূলত অবৈদিক, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং যাদুবিশ্বাস নির্ভর পূজা। আদিম সমাজের সমষ্টিপ্রবণতা বা গোষ্ঠীচেতনা থেকেই লোকায়ত এই ব্রতানুষ্ঠানের বিকাশ ও বিবর্তন বলা যায়। আবার দেখা যায় যে একই ব্রত কখনোও একই নামে বা কখনোও ভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয়। এই ব্রতগুলি পালনের মধ্য দিয়ে প্রচলন অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ পরিবর্তনের একটা আভাস পাওয়া যায়। বাংলার ষষ্ঠীব্রত মূলত উর্বরতা তন্ত্র বা Fertility Cult- এরই প্রতিরূপ। বাংলার কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে এই ব্রতের একান্ত নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে কৃষিজীবীদের ঘরে বৎসরের প্রথম ফসল ছিল ব্রীহি। এখন এর তদ্ভব শব্দ 'বোরো'। ব্রীহি ধান ষাট দিনে পাকে। তাই এই ধান্যের দেবী হলেন ষষ্ঠী। কালক্রমে ষষ্ঠী হলেন সন্তানদায়িনী। নারীর ও প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে সেদিনের লোকসমাজ একটি নিবিড় ও গভীর যোগ কল্পনা করেছিল। তাই কৃষিভিত্তিক সমাজের ষষ্ঠীপূজা হয়ে উঠল নারীকেন্দ্রিক। এই উর্বরতা তন্ত্রেরই ছায়াপাত ঘটেছে উত্তরবঙ্গের ষাটব্রতের মধ্যে। ব্রতিনীরা জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি থেকে ৩রা আষাঢ় পর্যন্ত এই ব্রত পালন করে। সধবা ও কুমারীরা জ্যৈষ্ঠমাসের চারদিন বাকি থাকতে এই ব্রতের পিঁড়ি সাজায়। কাঠের পিঁড়ির ওপর মাটি দিয়ে তার উপর পঞ্চশস্য দানা রাখা হয়। শস্যদানা থেকে অঙ্কুর বের হলে সেগুলি একসঙ্গে বেঁধে পিরামিডের মতো তৈরি করা হয় এবং এর মাথায় লাল জবাফুল বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর প্রতিদিন জল ছিটানো হয় এই অঙ্কুরগুলির ওপর। ঐ পিঁড়িতেই লক্ষ্মী, বাসুদেব ও হর-গৌরির পুজো করা হয় নানা নৈবেদ্যসহ। এরপর ব্রতিনীরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ব্রতকথা শোনে। এই ব্রতের তিনটি কাহিনী আছে। ব্রতকথা শুনতে শুনতে ব্রতিনীরা চালের গুঁড়ো দিয়ে পুতুল, হাঁড়ি, উনুন ইত্যাদি তৈরি করে। ব্রতিনীরা এগুলি সব দেবতাকে উৎসর্গ করে। এরপর ব্রতিনী তুলসীপাতা হাতে নিয়ে সেটি পিঁড়ির পাশে রেখে দিয়ে ব্রতপালন সাঙ্গ করে।

এই ব্রতের উপকরণের মধ্যে নানা শস্যদানা ও নানা ফল দেওয়া হয়। ব্রতটি কৃষি ও সন্তানের সঙ্গে যুক্ত। ষাট অর্থাৎ ষষ্ঠী, তাই এই ব্রতের মধ্যে সন্তানলাভের কামনাও ব্যক্ত হয়। এই ব্রতে সন্তান রক্ষয়িত্রী দেবী ষষ্ঠীর আরাধনা করা হয়। এই ব্রতকথার গানের মধ্যে ষষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে এবং এর তিনটি ব্রতকথাতেই সন্তানলাভ ও শস্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। তাই এই ব্রতটি যে উর্বরতাবাদের সঙ্গে যুক্ত একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ষষ্ঠীর মধ্যে উর্বরতা বা প্রজনন ক্ষমতা অনুষঙ্গেই যুক্ত শিশুপালন ও রক্ষার বৈশিষ্ট্য এসে গেছে। এ প্রসঙ্গে বাংলার ব্রত সম্বন্ধে বিনয় ঘোষের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: " মানুষের কামনা-বাসনা পরিপূরণের জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান, কিন্তু কামনা-বাসনা বা তার অনুষ্ঠান কোনোটাই ব্যক্তির জন্য নয়, জনগোষ্ঠীর জন্য, সমষ্টির জন্য, সমাজের জন্য"।[২০]

নৃবিজ্ঞানীরা আদিম মানুষের ব্রতানুষ্ঠানকে ম্যাজিক বা যাদুবিশ্বাস বলে অভিহিত করেছেন। James George Frazer তাঁর 'The Golden Bough: A Study in Magic and Religion'(1963) শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, আদিম মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে শেখেনি বলে তারা ঐন্দ্রজালিক চিন্তা করেছে বা যাদু-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ষষ্ঠীব্রত করলে নারী সন্তানবতী হবে এবং মা ষষ্ঠী শিশুকে পালন বা রক্ষা করবেন এই বিশ্বাসেই ষষ্ঠীব্রত করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও ষষ্ঠীব্রতের মধ্যে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত থেকে বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। দেবী ষষ্ঠীর আলোচনা প্রসঙ্গে এমনই দুটি দিক হল তিনি বিড়াল বাহনা কেন এবং তাঁর নাম সংখ্যাবাচক কেন?

প্রথমেই আসা যাক বাহন প্রসঙ্গে। মানুষ যখন পশুপালনমূলক অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছে, তখনই সে তার গোষ্ঠীজীবনেও স্ত্রী-পশুর ঋতুরজঃক্ষরণ, মিলন এবং সন্তান উৎপাদনের মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিল। প্রাক্-পশুপালন যুগে এ ক্ষমতা তার ছিলনা। নিজের বংশবৃদ্ধিও যে এই পথেই হতে পারে তখন থেকেই মানুষ তা প্রাথমিক পর্যায়ে অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পেরেছিল। এখন প্রশ্ন হল, মানুষ অন্য সব প্রাণীকে বাদ দিয়ে বিড়ালকেই প্রজননের দেবীর আদিরূপে কল্পনা করল এবং পরবর্তীকালে ষষ্ঠীর বাহন করে দিল কেন? কারণ ঋতুচক্রের দিক থেকে নারীর সঙ্গে বিড়ালীর অদ্ভুত মিল রয়েছে। মানবীর ক্ষেত্রে ঋতুচক্র আবর্তিত হয় প্রতি চার সপ্তাহ পর, বিড়ালের তিন। ঋতুকাল উভয়ের ক্ষেত্রেই পাঁচদিন। কিন্তু সার্থক মিলন হলে বিড়াল বৎসরে পাঁচবার সন্তানধারণ করতে পারে, যেহেতু তার গর্ভধারণকাল ৬৩ থেকে ৬৫ দিন। এক গর্ভে সে বহু সন্তানের জন্ম দিতে পারে। অতএব অর্থনৈতিক দিক থেকে তার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই প্রজননের ক্ষেত্রে বিড়াল আদর্শ স্থানীয় হয়ে দাঁড়ালো। গৃহপালিত অন্য কোন পশুই এত বেশিবার ও পরিমাণ সন্তান দিতে পারেনা। ফলে সে দেবীর আসনে বসল এবং তার কাছেই মানবী প্রার্থনা করল সন্তান। অন্যদিকে বিড়ালের মাতৃস্নেহের সঙ্গে অন্য কোন প্রাণীর তুলনা হয়না। চোখ-না ফোটা পর্যন্ত শাবকের প্রতি তার আচরণ লক্ষণীয়। তাই সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গলকামনাও নারীকুল ষষ্ঠীরূপিণী বিড়ালদেবীর কাছেই করে থাকে।[২১] এই জন্যেই সে হল দেবীর বাহন। তাই গৃহস্থ বাড়িতে, বিশেষ করে যাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন তাদের ঘরে বিড়াল মান্য করে থাকে। এমনকি বিড়াল মারলে মুখে কুটো নিয়ে দশ বাড়ি মাগন চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

এইবার দেখা যাক দেবীর নাম সংখ্যাবাচক হল কেন? বৈদিক ও পৌরাণিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানে ছয় সংখ্যার আধিপত্য সর্বত্র। এমনকি অগ্নির ছয়বার বীর্য নিষেকে দেবসেনা লাভ (জন্ম) হয়েছে, এবং ঐ নিষেকীকরণ ঘটেছে শুক্ল বা শুভ্র পক্ষে। নারীর ঋতুমতী হওয়াকে ইংরাজীতে বলা হয় Menses (Menstruate- বিশেষে পাচ্ছি Menstruation)– Webster Dictionary এর অর্থ করেছে: "A periodical bloody flow from the uterus of a female mamal, resulting when an ovum is not fertilirzed, and occurring in women about once every lunar month."[২২]

এইজন্য এই সময়ে নারী-পুরুষের মিলনে ফল উৎপাদন বা সন্তান জন্ম নেয়না।

'স্ত্রী-দেহ বিজ্ঞান' (Gynaecology) বলছে যে রজঃক্ষরণ প্রতিক্ষেত্রেই ছয়দিন পর্যন্ত স্থায়ী। অর্থাৎ পাঁচদিনের পর অর্থাৎ ছয়দিন থেকেই নারী-পুরুষের সঙ্গে মিলনের জন্য আস্তে আস্তে প্রস্তুত হতে থাকে। ঋতুকালে শাস্ত্র বা স্বাস্থ্য অননুমোদিত না হলেও রুচির কারণে সাধারণত কেউ নারীসঙ্গম করেনা। একমাত্র যাঁরা ধর্মের নামে দেহসাধনা করেন তারাই ঋতুকালে নারীতে উপগত হন– যেমন বাউল সম্প্রদায়। এই ছ-দিনই সর্বোচ্চ ঋতুকাল এবং ছয়দিন থেকেই নারীদেহ প্রজনন বার্তা প্রচারে সক্ষম বলে গণ্য, এবং চোদ্দ দিন পর্যন্ত সে সেই বার্তা বহন করতে থাকে। সুপ্রাচীন কালের মানুষ জৈবিক অভিজ্ঞতা থেকে ছয় বা ষষ্ঠ দিবসই মানবীর উর্বরতার সূচনাকাল ধরে নিয়ে উর্বরতা দেবীর নাম দিয়েছে ষষ্ঠী। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম বা চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে ছয়দিনের পর থেকেই ডিম্বাণু নিষ্ক্রমণের (Ovulation) সম্ভাবনার সূচনাকাল আরম্ভ হয়ে যায় বলেই উর্বরতাবাদ ও শিশুরক্ষাকারী ষষ্ঠীদেবীর সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই ষষ্ঠীদেবীর নাম সংখ্যাবাচক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।[২৩]

ষষ্ঠীব্রতের আচার-অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ব্রত হল চিত্র-নাট্য-গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম। ব্রতের আলপনার ভিতর দিয়ে চিত্রের পরিচয়, আচার-অনুষ্ঠানের যে ক্রিয়া বা অভিনয় করা হয় তার মধ্যে দিয়ে নাট্যের পরিচয় এবং ছড়া ও গানের মধ্যে দিয়ে সুর সহযোগে গীতের পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। ব্রতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এখানেই যে ব্রতীই হল ব্রতের প্রকৃত শিল্পী যে অঙ্কণ, গান, অভিনয় বা নৃত্য সব কছুই করে। তাই দেখা যায় যে ব্রতের আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠান সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এককথায় বলতে গেলে ষষ্ঠীব্রতের মধ্য দিয়ে যেমন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক দিক ফুটে ওঠে তেমনি এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিতও। তাই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ব্রতের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার : নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার সব থেকে বড় অবলম্বন হল সন্তান। তাই তাঁর নির্বিঘ্নে জন্ম এবং পরবর্তীকালে তার রক্ষার উদ্দেশ্যে নারী তথা জননী-হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই অতিলৌকিক শক্তির উপর আস্থাশীল হয়ে পড়ে, আর সেই মানসিকতাই জন্ম দেয় মা ষষ্ঠীর। তিনি প্রভাবিত করেন সমগ্র নারীসমাজকে। বারো মাসে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ষষ্ঠীদেবী পূজিতা হন। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলেই তাঁর ব্রত বেশি পালিত হয়। শিক্ষার প্রসার যতই ঘটুক না কেন, ব্রতাচারগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, আজও বেঁচে আছে। তার কারণ মানুষের বাইরেটা যত দ্রুত বদলায়, ভেতরটা তত দ্রুত বদলায়না। আর এগুলো মানুষের একান্ত অন্তরের বিষয়। তাছাড়া মানুষের প্রাথমিক কামনা-বাসনার স্বরূপ মূলত এক। আর তাই ষষ্ঠীব্রতের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জননী হৃদয়ের চিরন্তন আকুতি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বহু ব্রতেরই প্রাসঙ্গিকতা আমরা হারিয়ে ফেললেও তা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো আজও বয়ে চলেছে। তাই বাংলার ষষ্ঠীব্রতগুলির মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতিটি নারীর কামনায় আজও প্রকাশ পায়: 'সরু ধানে কালো পুতে, জন্ম যায় যেন এয়োতে এয়োতে'।

তথ্যসূত্র :

১. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, ২০০৪, শিশুচারণা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ.১।

২. সরকার, সুধীরচন্দ্র, পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫২৮,৫২৯।

৩. নস্কর, দেবব্রত, ১৯৯৯, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৯২।

৪. Koshambi, D.D., Exasperating Essays, India Book Exchang, Calcutta, P.P.88 (উদ্ধৃত: মৈত্র, অলোক, ২০০০, বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধানে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৪০)।

৫. মজুমদার,তুলিকা, ২০০৬, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ নারী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ১৭১।

৬. দে, দিলীপকুমার, ২০০৭, কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৬২।

৭. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৬, পৃ. ১৬২।

৮. বিশ্বাস, রণজিৎ, ২০০১, লোকঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ, ইন্দিরা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭৭।

৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৬, পৃ. ১৬২

১০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৬, পৃ. ১৬৩

১১. দেবী, সুহাসিনী, ১৩৯২, মেয়েলী ব্রতকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩৬, ৩৭।

১২. ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা), ২০০২, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ: বাঁকুড়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ১৩২,১৩৩।

১৩. দাস, কৃষ্ণরাম, ১৩৩৩, ষষ্ঠীমঙ্গল, পৃ. ১৬১ (উদ্ধৃত: বসাক, শীলা, ১৯৯৮, বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১০০)।

১৪. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, ১৯৪৯, মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২১৩ (উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১০০)।

১৫. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা), কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৫২ (উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১০১)।

১৬. দীন, সেলিম আল, ১৯৯৬, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, ঢাকা, পৃ. ২৬০ (উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১০১)।

১৭. কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ১৯৫৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৬২ (উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১০২)।

১৮. গাঙ্গুলি মাণিকরাম, ১৯৬০, ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ৩৩৫(উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১০২)।

১৯. নামবিহীন রচনা, ১২৯৮, বামাবোধিনী পত্রিকা ৩২২ সংখ্যা, ৫ম ভাগ, পৃ. ১৯৫ (উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১৬৯)।

২০. ঘোষ, বিনয়, ১৩৯৬, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, পৃ. ৫৩ (উদ্ধৃত: পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১৩, পৃ. ১২৫)।

২১. মিত্র, সনৎকুমার, ১৪১০, শিশুর ব্রত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা: শিশু সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৭৭, ১৭৮।

২২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২১, পৃ. ১৭৯।

২৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২১, পৃ. ১৭৯, ১৮১।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা), ২০০৭, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ২য় সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।
২. চৌধুরী, দুলাল (সম্পা), ২০১৩, লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ (নব সংযোজন), পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৩. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা), ১৩৯১ (নবসংস্করণ), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ [কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস-প্রণীতম], নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা।
৪. দে, দিলীপকুমার, ২০০৭, কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা।
৫. দেবী, সুহাসিনী, ১৩৯২, মেয়েলী ব্রতকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৬. নস্কর, দেবব্রত, ১৯৯৯, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৭. বসাক, শীলা, ১৯৯৮, বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৮. বিশ্বাস, রণজিৎ, ২০০১, লোকঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ, ইন্দিরা প্রকাশনী, কলকাতা।
৯. ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা), ২০০২, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ: বাঁকুড়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।
১০. ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা), ২০০২, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ: বর্ধমান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।
১১. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, ২০০৪, শিশুচারণা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
১২. মজুমদার, তুলিকা, ২০০৬, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ নারী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।
১৩. মাইতি, প্রদ্যোতকুমার, ২০০১, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
১৪. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পা), ১৯৯৫, লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা: ৬, মেয়েলি ব্রত বিষয়ে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
১৫. মৈত্র, অলোক, ২০০০, বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধানে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
১৬. মৈত্র, রঞ্জিতা, বাঙলার লোকব্রতে আলপনার ভূমিকা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
১৭. সরকার, সুধীরচন্দ্র, পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

পত্র-পত্রিকা:

১. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পা), ১৪১০, বৈশাখ-আষাঢ়, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা: 'শিশু' সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা।